

Barcode : 4990010205060

Title - Kamalakanta

Author - Chattopadhyay, Bankimchandra

Language - bengali

Pages - 274

Publication Year - 1885

Barcode EAN.UCC-13

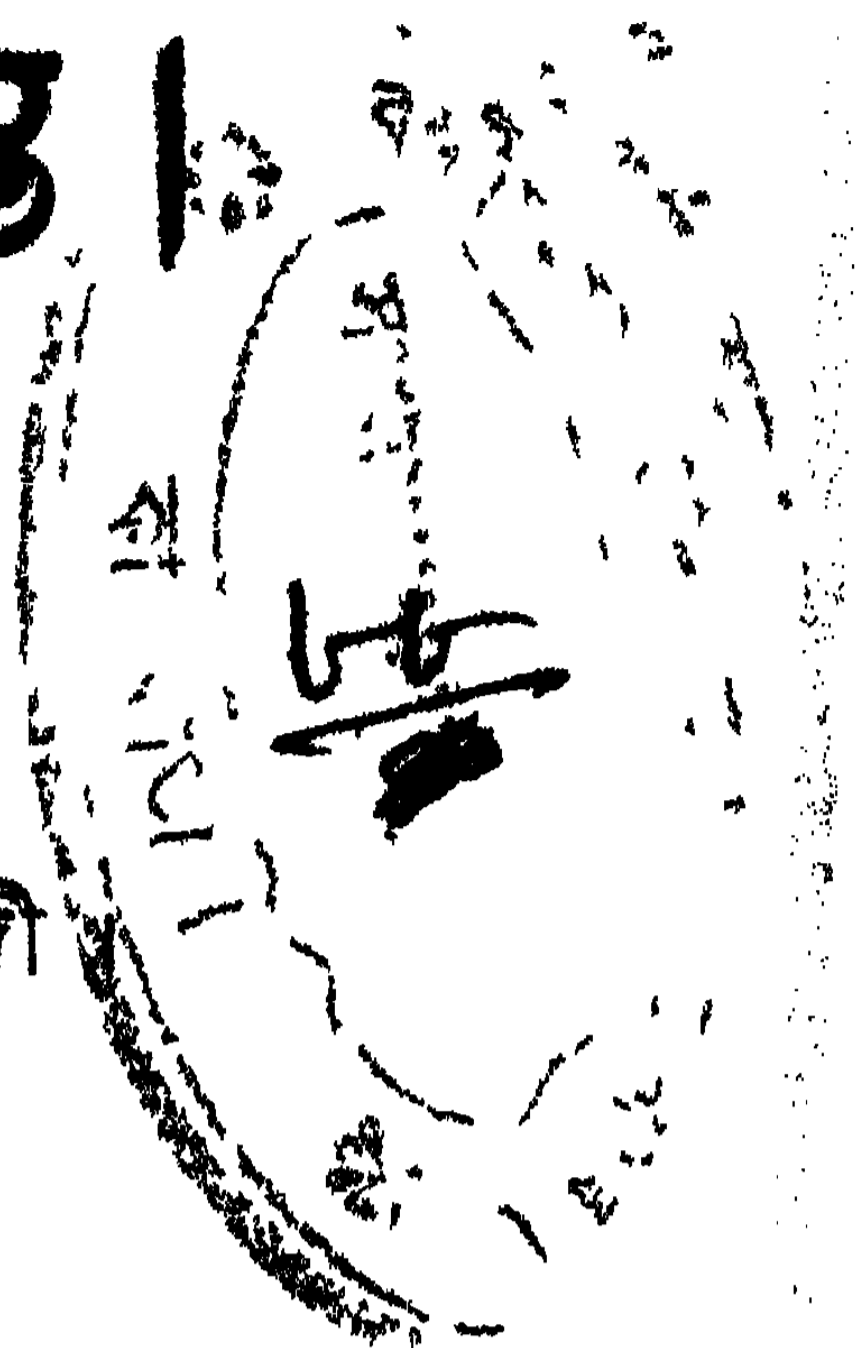


4 990010 205060

কমলাকান্ত ।

২য় অঙ্ক
অর্থাৎ

- ১। কমলাকান্তের দপ্তর ।
- ২। কমলাকান্তের পত্র ।
- ৩। কমলাকান্তের জীবনবন্দী



শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত ।

বাহিরে যাইবে না
কলিকাতা,

৩৭ নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীট—বীণাযন্ত্রে
শ্রীশুরচন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত

ও

২ নং ভবানীচরণ দস্তেব লেন হইতে
শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক
প্রকাশিত ।

—

১২৯২

১৮৮৫

মূল্য ১।০ টাকা ।

বিজ্ঞাপন

এই গ্রন্থ কেবল “কমলাকান্তের দপ্তরের” পুনঃ সংস্করণ

নহে। “কমলাকান্তের দপ্তর” ভিন্ন ইহাতে “কমলাকান্তের পত্র” ও “কমলাকান্তের জোবানবন্দী” এই দুইখানি নূতন গ্রন্থ আছে।

কমলাকান্তের দপ্তরেও দুইটি নূতন প্রবন্ধ এবার বেশী আছে। “চন্দ্রালোকে,” এবং “স্ত্রীলোকের রূপ” এই দুইটি প্রবন্ধ কমলাকান্তের দপ্তরের প্রথম সংস্করণে পরিত্যাগ করা গিয়াছিল। তাহার কারণ এই যে, ঐ দুইটি আমার প্রণীত নহে। “চন্দ্রালোকে” আমার প্রিয় সূহৃৎ শ্রীমান্ বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের রচিত ; এবং “স্ত্রীলোকের রূপ” আমার প্রিয় সূহৃৎ শ্রীমান্ বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচিত। উহারা স্ব স্ব রচনার সঙ্গে ঐ প্রবন্ধদ্বয় পুনর্মুদ্রিত করিবেন, এই ইচ্ছায়, আমি কমলাকান্তের দপ্তরের প্রথম সংস্করণে ঐ দুইটি পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। এক্ষণে লেখকদিগের নিকট জানিয়াছি যে, তাঁহারা ঐ দুইটি প্রবন্ধ নিজে নিজে পুনর্মুদ্রিত করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব, তাঁহাদের

ইচ্ছানুসারে, ঐ দুইটি প্রবন্ধ কমলাকান্তের দপ্তরের দ্বিতীয় সংস্করণ-ভুক্ত করা গেল।

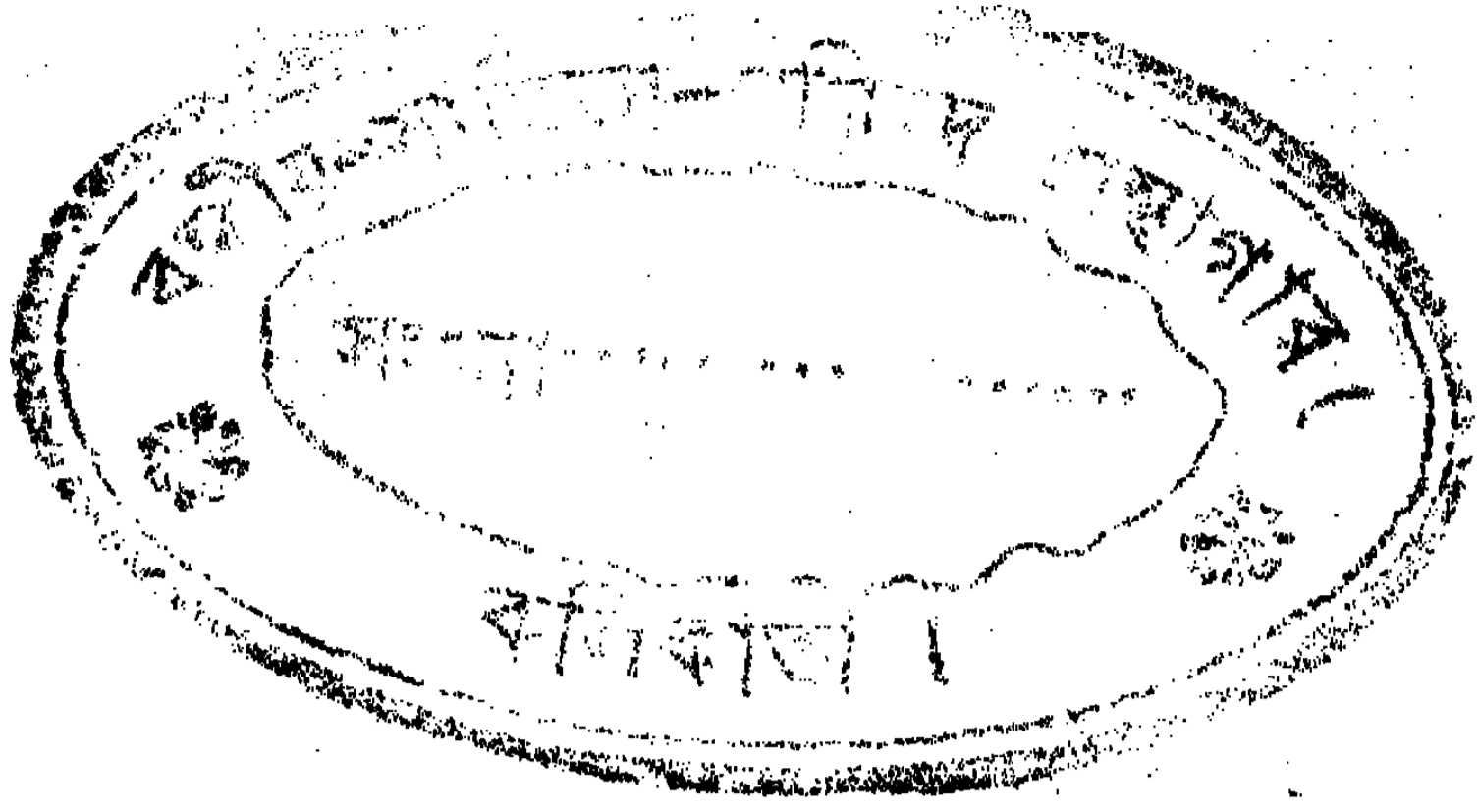
কমলাকান্তের পত্র তিনখানি মাত্র বঙ্গ-দর্শনে প্রকাশিত হয়। তিনখানি ভাঙ্গিয়া এখন চারিখানি হইয়াছে। “বুড়া বয়সের কথা” যদিও বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের নামসূক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই, তথাপি উহার মর্শ্ব কমলাকান্তি বলিয়া উহাও “কমলাকান্তের পত্র” মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি। মোটে পাঁচখানি।

“কমলাকান্তের জ্ঞানবন্দী” সমেত সর্বশুদ্ধ আটটি নূতন পুনর্মুদ্রিত করা গেল। গ্রন্থের আকার অনেক বাড়িয়াছে বলিয়া এবং অন্যান্য কারণেও গ্রন্থের মূল্যও বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছি।

১৮৮৩
১৮৮২

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

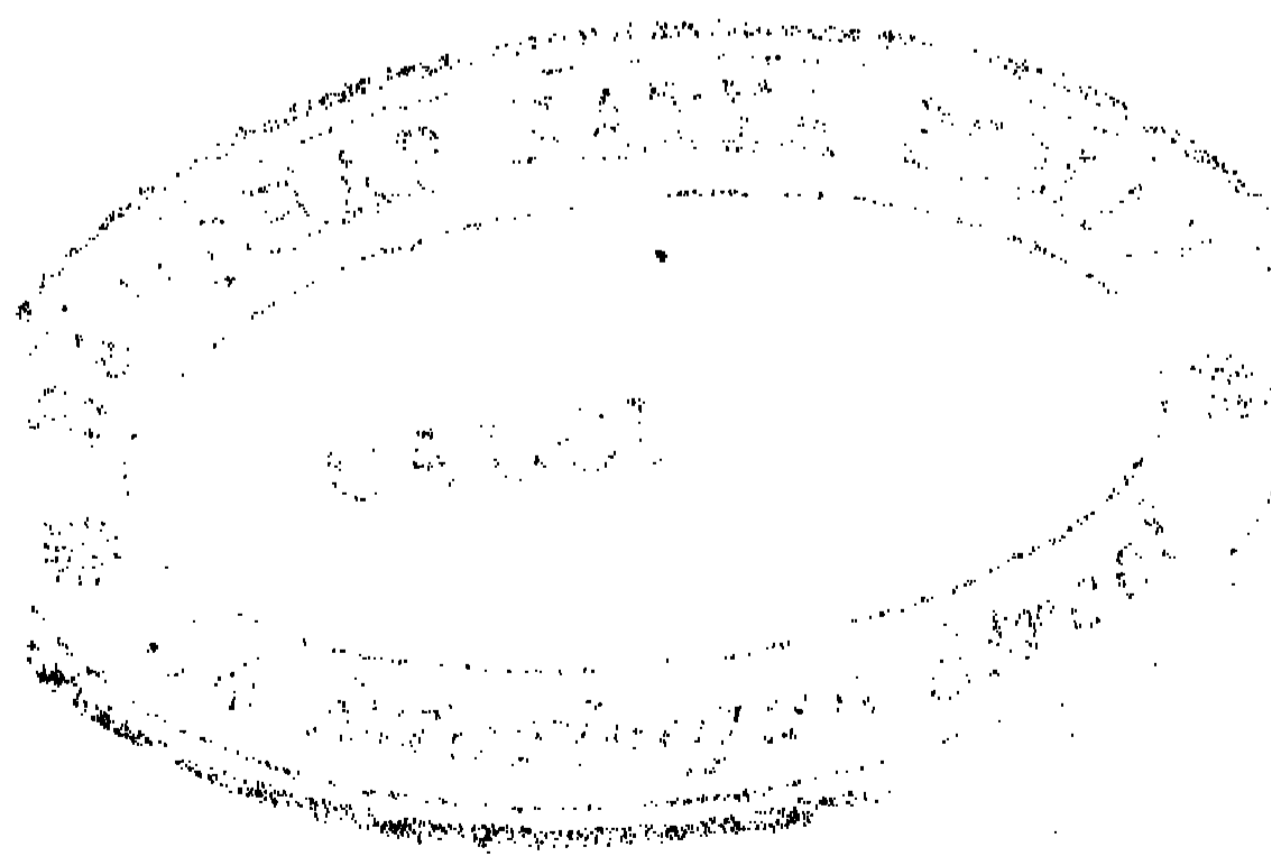
—



দুশাপা
বাহিরে বাহিরে না

কমলাকান্তের দপ্তর ।

(দ্বিতীয় সংস্করণ ।)



সূচী ।

কমলাকান্তের দপ্তর	১
১ সংখ্যা একা	৫
২ " মনুষ্যফল	১২
৩ " ইউটিলিটি বা উদর-দর্শন	২৭
৪ " পতঙ্গ	৩৬
৫ " আমার মন	৪৪
৬ " চন্দ্রালোকে	৬২
৭ " বসন্তের কোকিল	৮৪
৮ " স্ত্রীলোকের রূপ	৯৪
৯ " ফুলের বিবাহ	১১১
১০ " বড় বাজার	১২০
১১ " আমার দুর্গোৎসব	১৩৭
১২ " একটি গীত	১৫৪
১৩ " বিড়াল	১৬১
কমলাকান্তের পত্র	১৭৩
১ সংখ্যা কি লিখিব ?	১৭৫
২ " পলিটিক্‌স্	১৮২
৩ " বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব	১৯৩
৪ " বুড়া বয়সের কথা	২০১
৫ " কমলাকান্তের বিদায়	২১৭
কমলাকান্তের জীবানবন্দী	২২৩

প্রথম বারের

উৎসর্গ।

পণ্ডিতাগ্রগণ্য

শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন মহাশয়কে

এই গ্রন্থ

প্রণয়োপহার স্বরূপ

অর্পিত

হইল।



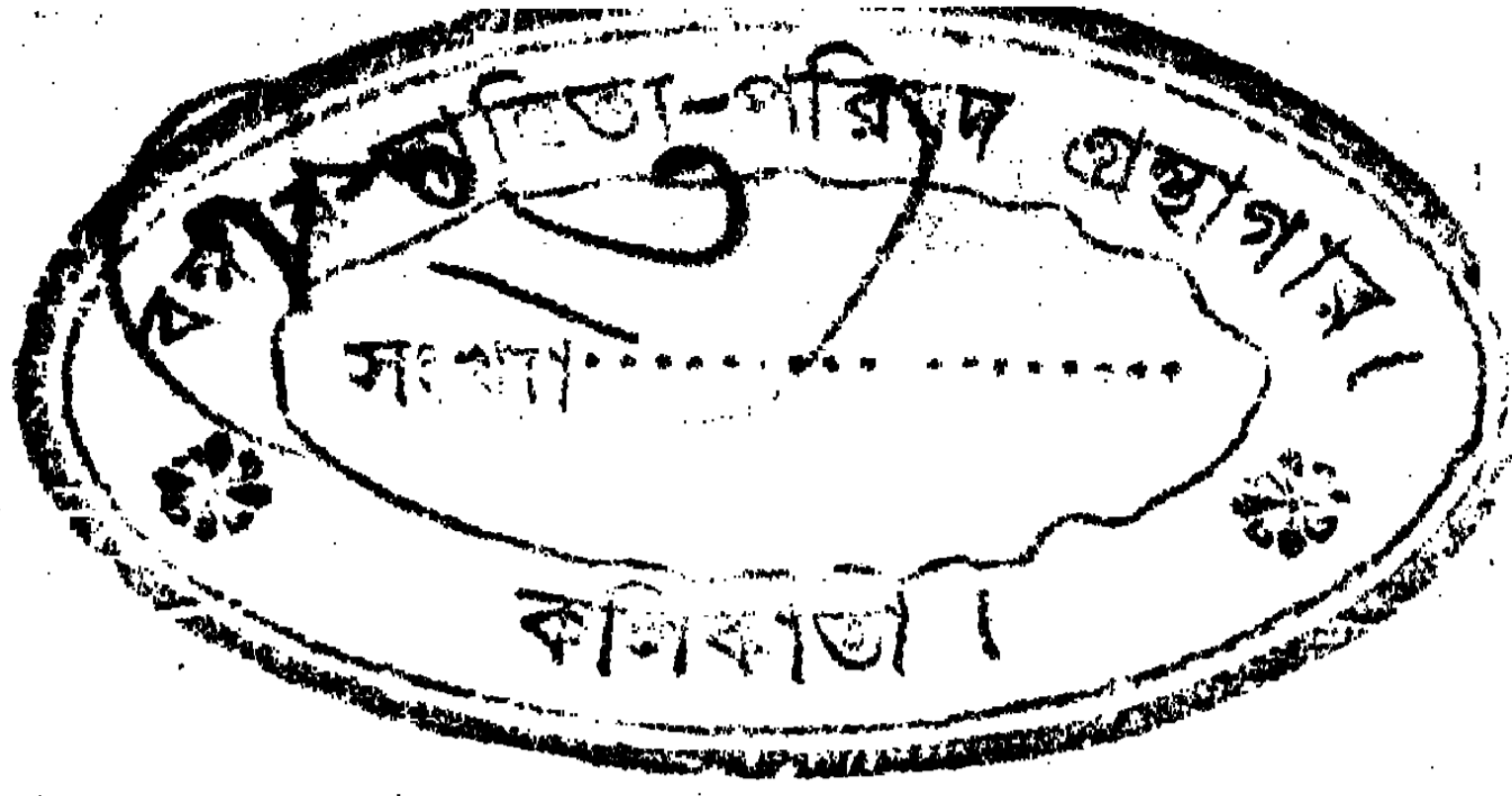
প্রথম বারের

বিজ্ঞাপন ।

কমলাকান্তের দপ্তর বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত করা
গেল। বঙ্গদর্শনে যে কয় সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে, তাহার
মধ্যে “চন্দ্রলোকে”, “মশক” এবং “স্ত্রীলোকের রূপ” এই
তিন সংখ্যা আমার প্রণীত নহে; এই জন্ত ঐ তিন সংখ্যা
পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না।

বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের দপ্তর সমাপ্ত হয় নাই। এই
জন্ত এই গ্রন্থের নামকরণে “প্রথম খণ্ড” লেখা হইল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।



কমলাকান্তের দপ্তর ।



অনেকে কমলাকান্তকে পাগল বলিত । সে কখন কি বলিত, কি করিত, তাহার স্থিরতা ছিল না । লেখা পড়া না জানিত, এমত নহে । কিছু ইংরাজি, কিছু সংস্কৃত জানিত । কিন্তু যে বিদ্যায় অর্থোপার্জন হইল না, সে বিদ্যা কি বিদ্যা ? আসল কথা এই, সাহেব সুবোর কাছে যাওয়া আসা চাই । কত বড় বড় মূর্খ, কেবল নাম দস্তখত করিতে পারে,—তাহারা তালুক মুলুক করিল—আমার মতে তাহারাই পণ্ডিত । আর কমলাকান্তের মত বিদ্বান, যাহারা কেবল কতকগুলি বহি পড়িয়াছে, তাহার। আমার মতে গণ্ডমূর্খ ।

কমলাকান্তের এক বার চাকরি হইয়াছিল । এক জন সাহেব তাহার ইংরাজি কথা শুনিয়া,

ডাকিয়া লইয়া গিয়া একটি কেরাণীগিরী দিয়া-
 ছিলেন। কিন্তু কমলাকান্ত চাকরি রাখিতে
 পারিল না। আপিসে গিয়া, আপিসের কাজ
 করিত না। সরকারি বহিতে কবিতা লিখিত—
 আপিসের চিঠিপত্রের উপরে সেক্ষপীয়র নামক
 কে লেখক আছে, তাহার বচন তুলিয়া লিখিয়া
 রাখিত; বিলবহির পাতায় পাতায় ছবি আঁকিয়া
 রাখিত। এক বার সাহেব তাহাকে মাস্কাবারের
 পে-বিল্ প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলেন। কমলা-
 কান্ত বিলবহি লইয়া একটি চিত্র আঁকিল, যে
 কতকগুলি নাগা ফকির সাহেবের কাছে ভিক্ষা
 চাহিতেছে, সাহেব দুই চারটা পয়সা ছড়াইয়া
 ফেলিয়া দিতেছেন। नीচে লিখিয়া দিল “যথার্থ
 পে-বিল্।” (অলঙ্কার স্বরূপ সাহেবের একটি
 লাদুল আঁকিয়া দিয়াছিল—এবং হস্তে একটি
 মর্জমান রস্তা দেখা যাইতেছিল।) সাহেব নূতন-
 তর পে-বিল্ দেখিয়া কমলাকান্তকে মানে মানে
 বিদায় দিলেন।

কমলাকান্তের চাকরি সেই পর্য্যন্ত। অর্থেরও
 বড় প্রয়োজন ছিল না। কমলাকান্ত কখন দার-

পরিগ্রহ করেন নাই। স্বয়ং যেখানে হয়, দুইটি
অন্ন এবং আধ ভরি আফিম পাইলেই হইত।
যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিত। অনেক দিন
আমার বাড়ীতে ছিল। আমি তাহাকে পাগল
বলিয়া যত্ন করিতাম। কিন্তু আমিও তাহাকে
রাখিতে পারিলাম না। সে কোথাও স্থায়ী
হইত না। এক দিন প্রাতে উঠিয়া ব্রহ্মচারীর
মত গেরুয়া-বস্ত্র পরিয়া, কোথায় চলিয়া গেল।
কোথায় চলিয়া গেল, আর তাহাকে পাইলাম
না। সে এ পর্য্যন্ত আর ফিরে নাই।

তাহার একটি দপ্তর ছিল। কমলাকান্তের
কাছে ছেঁড়া কাগজ পড়িতে পাইত না ; দেখি-
লেই তাহাতে কি মাথা মুণ্ড লিখিত, কিছু বুঝিতে
পারা যাইত না। কখন কখন আমাকে পড়িয়া
শুনাইত—শুনিলে আমার নিক্রম আসিত।
কাগজগুলি একখানি মসীচিত্রিত, পুরাতন, জীর্ণ
বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা থাকিত। গমনকালে, কমলাকান্ত
আমাকে সেই দপ্তরটি দিয়া গেল। বলিয়া গেল,
তোমাকে ইহা বখ্শিশ্ করিলাম।

এ অমূল্য রত্ন লইয়া আমি কি করিব ? প্রথমে

মনে করিলাম, অগ্নিদেবকে উপহার দিই। পরে
লোকহিতৈষী আমার চিত্তে বড় প্রবল হইল।
মনে করিলাম যে, যে লোকের উপকার না করে,
তাহার বৃথায় জন্ম। এই দপ্তরটিতে অত্যাৎকৃষ্ট
অনিদ্রার ঔষধ আছে—যিনি পড়িবেন, তাহারই
নিদ্রা আসিবে। যাঁহারা অনিদ্রা রোগে পীড়িত,
তাঁহাদিগের উপকারার্থে আমি কমলাকান্তের
রচনাগুলি প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রী ভীষ্মদেব খোষনবীশ।



প্রথম সংখ্যা ।

একা ।

“কে গায় ওই ?”

বহুকাল বিস্মৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় ঐ মধুর গীতি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল । এত মধুর লাগিল কেন ? এই সংগীত যে অতি সুন্দর, এমত নহে । পৈথিক পথ দিয়া, আপন মনে গায়িতে গায়িতে যাইতেছে । জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি দেখিয়া, তাহার মনের আনন্দ উছলিয়া উঠিয়াছে । স্বভাবতঃ তাহার কণ্ঠ মধুর ;— মধুর কণ্ঠে, এই মধুমাসে, আপনার মনের সুখের মাধুর্যা বিকীর্ণ করিতে করিতে যাইতেছে । তবে বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্যের তন্ত্রীতে অঙ্গুলি স্পর্শের ন্যায়, ঐ গীতিধ্বনি আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিল কেন ?

কেন, কে বলিবে ? রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—
নদী-সৈকতে কোমুদী হাসিতেছে । অন্ধারতা
সুন্দরীর নীল বসনের ন্যায় শীর্ণ-শরীর। নীল-
সলিলা তরঙ্গিণী, সৈকত বেষ্টিত করিয়া চলি-
য়াছেন ; রাজপথে, কেবল আনন্দ—বালক,
বালিকা, যুবক, যুবতী, প্রোঢ়া, বৃদ্ধা, বিমল চন্দ্র-
কিরণে স্নাত হইয়া, আনন্দ করিতেছে । আমিই
কেবল নিরানন্দ—তাই ঐ সংগীতে আমার হৃদয়-
যন্ত্র বাজিয়া উঠিল ।

আমি একা—তাই এই সংগীতে আমার
শরীর কণ্টকিত হইল । এই বহুজনাকীর্ণ নগরী
মধ্যে, এই আনন্দময়, অনন্ত জনশ্রোতোমধ্যে,
আমি একা । আমিও কেন ঐ অনন্ত জনশ্রো-
তোমধ্যে মিশিয়া, এই বিশাল আনন্দতরঙ্গ-
তাড়িত জলবুদ্বুদ সমূহের মধ্যে আর একটি
বুদ্বুদ না হই ? বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্রে ;
আমি বারিবিন্দু এ সমুদ্রে মিশাই না কেন ?

তাহা জানি না—কেবল ইহাই জানি যে,
আমি একা । কেহ একা থাকিও না । যদি
অন্য কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে

তোমার মনুষ্যজন্ম বৃথা। পুষ্প সুগন্ধী, কিন্তু যদি স্রোতগ্রহণকর্তা না থাকিত, তবে পুষ্প সুগন্ধী হইত না—স্রোতেন্দ্রিয়বিশিষ্ট না থাকিলে গন্ধ নাই। পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুমুমকে প্রস্ফুটিত করিও।

কিন্তু বারেক মাত্র শ্রুত ঐ সংগীত আমার কেন এত মধুর লাগিল, তাহা বলি নাই। অনেক দিন আনন্দোখিত সংগীত শুনি নাই—অনেক দিন আনন্দানুভব করি নাই। যৌবনে, যখন পৃথিবী সুন্দরী ছিল, যখন প্রতি পুষ্প সুগন্ধ পাইতাম, প্রতি পত্রমন্ডরে মধুর শব্দ শুনিতাম, প্রতি নক্ষত্রে চিত্রা রোহিণীর শোভা দেখিতাম, প্রতি মনুষ্যমুখে সরলতা দেখিতাম, তখন আনন্দ ছিল। পৃথিবী এখনও তাই আছে, সংসার এখনও তাই আছে, মনুষ্য-চরিত্র এখনও তাই আছে। কিন্তু এ হৃদয় আর তাই নাই। তখন সংগীত শুনিয়া আনন্দ হইত। আজি এই সংগীত শুনিয়া সেই আনন্দ মনে পড়িল। যে অবস্থায়, যে মুখে, সেই আনন্দ অনুভূত করিতাম,

সেই অবস্থা, সেই সুখ, মনে পড়িল । মুহূর্ত্ত জন্য আবার যৌবন ফিরিয়া পাইলাম । আবার তেমনি করিয়া, মনে মনে, সমবেত বন্ধুগণের মধ্যে বসিলাম ; আবার সেই অকারণসঙ্গীত উচ্চ হাসি হাসিলাম, যে কথা নিশ্চয়োজনীয় বলিয়া এখন বলি না, নিশ্চয়োজনেও চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু তখন বলিতাম, আবার সেই সকল বলিতে লাগিলাম ; আবার অকৃত্রিম হৃদয়ে পরের প্রণয় অকৃত্রিম বলিয়া মনে মনে গ্রহণ করিলাম । ক্ষণিক ভ্রান্তি জন্মিল—তাই এ সংগীত এত মধুর লাগিল । শুধু তাই নয় । তখন সংগীত ভাল লাগিত,—এখন লাগে না—চিত্তের যে প্রফুল্লতার জন্য ভাল লাগিত, সে প্রফুল্লতা নাই বলিয়া ভাল লাগে না । আমি মনের ভিতর মন লুকাইয়া সেই গত যৌবনসুখ চিন্তা করিতেছিলাম—সেই সময়ে এই পূর্বস্মৃতিসূচক সংগীত কর্ণে প্রবেশ করিল, তাই এত মধুর বোধ হইল ।

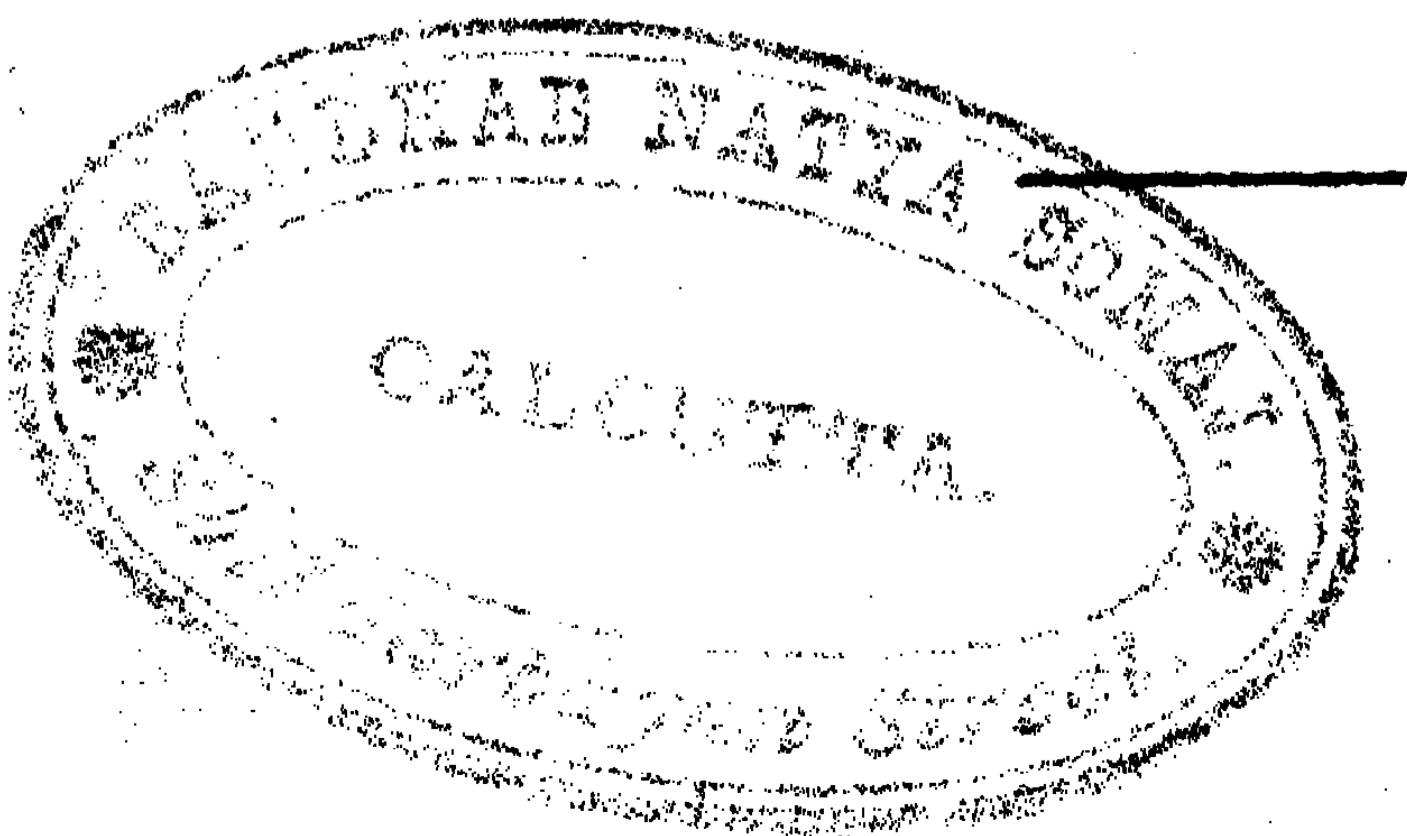
সে প্রফুল্লতা, সে সুখ, আর নাই কেন ? সুখের সামগ্রী কি কমিয়াছে ? অর্জন এবং ক্ষতি উভয়ই সংসারের নিয়ম । কিন্তু ক্ষতি অপেক্ষা

অর্জুন অধিক, ইহাও নিয়ম । তুমি জীবনের পথ
 যতই অতিবাহিত করিবে, ততই সুখদ সামগ্রী
 সঞ্চয় করিবে । তবে বয়সে স্ফূর্তি কমে কেন ?
 পৃথিবী আর তেমন সুন্দরী দেখা যায় না কেন ?
 আকাশের তারা আর তেমন জ্বলে না কেন ?
 কোকিলকে স্বর না। ভাবিয়া পাখী ভাবি কেন ?
 আকাশের নীলিমায় আর সে উজ্জ্বলতা থাকে না
 কেন ? যাহা তৃণপল্লবময়, কুসুমসুবাসিত, স্বচ্ছ
 কল্লোলিনী-শীকর-সিক্ত, বসন্তপবনবিধূত বলিয়া
 বোধ হইত, এখন তাহা বালুকাময়ী মরুভূমি
 বলিয়া বোধ হয় কেন ? কেবল রঙ্গিল কাচ নাই
 বলিয়া । আশা সেই রঙ্গিল কাচ । যৌবনে অ-
 র্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপরিমিতা ।
 এখন অর্জিত সুখ অধিক, কিন্তু সেই ব্রহ্মাণ্ড-
 ব্যাপিনী আশা কোথায় ? তখন জানিতাম না,
 কিসে কি হয়, অনেক আশা করিতাম । এখন
 জানিয়াছি, এই সংসারচক্রে আরোহণ করিয়া,
 যেখানকার আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিতে
 হইবে ; যখন মনে ভাবিতেছি, এই অগ্রসর
 হইলাম, তখন কেবল আবর্তন করিতেছি মাত্র ।

এখন বুঝিয়াছি যে, সংসার-সমুদ্রে সন্তরণ আরম্ভ করিলে, তরঙ্গে তরঙ্গে আমাকে প্রহত করিয়া আবার আমাকে কূলে ফেলিয়া যাইবে । এখন জানিয়াছি যে, এ অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই । এখন জানিয়াছি যে কুম্ভমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নিশ্চলা নদীতে আবর্ত আছে, ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প আছে ; মনুষ্য-হৃদয়ে কেবল আত্মাদর আছে । এখন জানিয়াছি যে, বৃক্ষে বৃক্ষে ফল ধরে না, ফুলে ফুলে গন্ধ নাই, মেঘে মেঘে বৃষ্টি নাই, বনে বনে চন্দন নাই, গজে গজে মৌক্তিক নাই । এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, কাচও হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল, পিত্তলও স্বর্ণের ন্যায় ভাস্কর, পঙ্কও চন্দনের ন্যায় স্নিগ্ধ, কাংসাও রজতের ন্যায় মধুরনাদী ।—কিন্তু কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গেলাম । সেই গীতধ্বনি ! উহা ভাল লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু আর দ্বিতীয় বার শুনিতে চাহি না । উহা যেমন মনুষ্যকণ্ঠজাত সংগীত,

তেমনি সংসারের এক সংগীত আছে । সংসার-
রসে রসিকেরাই তাহা শুনিতে পায় । সেই সং-
গীত শুনিবার জন্য আমার চিত্ত আকুল । সে
সংগীত আর কি শুনিব না ? শুনিব, কিন্তু নানা-
বাদ্যধ্বনিসংমিলিত, বহুকণ্ঠপ্রসূত সেই পূর্বশ্রুত
সংসারসংগীত আর শুনিব না । সে গায়কেরা
আর নাই—সে বয়স নাই, সে আশা নাই । কিন্তু
তৎপরিবর্তে যাহা শুনিতেছি, তাহা অধিকতর
প্রীতিকর । অনন্যসহায় একমাত্র গীতধ্বনিতে
কর্ণবিবর পরিপূরিত হইতেছে । প্রীতি সংসারে
সর্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি । প্রীতিই আমার
কর্ণে এক্ষণকার সংসারসংগীত । অনন্ত কাল
সেই মহাসঙ্গীত সহিত মনুষ্য-হৃদয়-তন্ত্রী
বাজিতে থাকুক ।-মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার
প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না ।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী ।



দ্বিতীয় সংখ্যা ।

মনুষ্য ফল ।

আফিমের একটু বেশী মাত্রা চড়াইলে, আমার বোধ হয়, মনুষ্য সকল ফল বিশেষ—
মায়ারূপে সংসার-রূক্ষে ঝুলিয়া রহিয়াছে, পাকি-
লেই পড়িয়া যাইবে । সকলগুলি পাকিতে পায়
না—কতক অকালে ঝড়ে পড়িয়া যায় । কোনটি
পোকায় খায়, কোনটিকে পাখীতে চোব্বায় ।
কোনটি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে । কোনটি সুপক্ক
হইয়া, আহরিত হইলে, গঙ্গাজলে ধৌত হইয়া
দেবসেবায় বা ব্রাহ্মণভোজনে লাগে—তাহা-
দিগেরই ফলজন্ম বা মনুষ্যজন্ম সার্থক । কোনটি
সুপক্ক হইয়া, বৃক্ষ হইতে খসিয়া পড়িয়া মাটিতে
পড়িয়া থাকে, শৃগালে খায় । তাহাদিগের মনুষ্য-
জন্ম বা ফলজন্ম বৃথা । কতকগুলি তিক্ত, কটু বা
কষায়,—কিন্তু তাহাতে অমূল্য ঔষধ প্রস্তুত হয় ।

কতকগুলি বিষময়—যে খায়, সেই মরে । আর
কতকগুলি মাকাল জাতীয়—কেবল দেখিতে
সুন্দর ।

কখন কখন ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিতে
পাই যে, পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের মনুষ্য পৃথক্
জাতীয় ফল । আমাদের দেশের এক্ষণকার বড়-
মানুষদিগকে মনুষ্যজাতি মধ্যে কাঁটাল বলিয়া
বোধ হয় । কতকগুলি খাসা খাজা কাঁটাল, কতক-
গুলির বড় আটা, কতকগুলি কেবল ভুতুড়িনার,
গোরুর খাদ্য । কতকগুলি ইচোড়ে পাকে,
কতকগুলি কেবল ইচোড়ই থাকে, কখন পাকে
না । কতকগুলি পাকিলে পাকিতে পারে, কিন্তু
পাকিতে পায় না, পৃথিবীর রান্ধস রান্ধসীরা
ইচোড়েই পাড়িয়া দালনা রাঁধিয়া খাইয়া
ফেলে । যদি পাকিল, ত বড় শৃগালের
দৌরাভ্য । যদি গাছ ঘেরা থাকে, ত ভালই ।
যদি কাঁটাল উঁচু ডালে ফলিয়া থাকে, ভালই ;
নহিলে শৃগালেরা কাঁটাল কোন মতে উদরসাৎ
করিবেন । শৃগালেরা কেহ দেওয়ান, কেহ
কারকুন, কেহ নাএব, কেহ গোমস্তা, কেহ

মোছায়েব, কেহ কেবল আশীর্বাদক । যদি এ সকলের হাত এড়াইয়া, পাকা কাঁটাল ঘরে গেল, তবে মাছি ভন্ ভন্ করিতে আবস্ত করিল । মাছিবা কাঁটাল চায় না, তাহারা কেবল একটু একটু রসের প্রত্যাশাপন্ন । এ মাছিটি কন্যা-ভার-গ্রস্ত, উহাকে এক ফোঁটা রস দাও,—ওটির মাতৃদায়, একটু রস দাও । এটি একখানি পুস্তক লিখিয়াছে, একটু রস দাও,—সেটি পেটের দায়ে একখানি সম্বাদ-পত্র করিয়াছে, উহাকেও একটু দাও । এ মাছিটি কাঁটালের পিসীর ভাণ্ডুরপুত্রের শ্যালার শ্যালীপুত্র—খাইতে পায় না, কিছু রস দাও ;—সে মাছিটির টোলে পৌনে চৌদ্দটি ছাত্র পড়ে, কিছু রস দাও । আবার এ দিকে কাঁটাল ঘরে রাখাও ভাল না—পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া উঠে । আমার বিবেচনায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া, উত্তম নির্জল দুগ্ধের ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া, কমলাকান্তের ন্যায় স্ত্রোক্ষণকে ভোজন করানই ভাল ।

এ দেশের সিবিল সর্কিসের সাহেবদিগকে আমি মনুষ্যজাতি মধ্যে আম্র ফল মনে করি ।

এ দেশে আম ছিল না, সাগর পার হইতে কোন মহাত্মা এই উপাদেয় ফল এ দেশে আনিয়া-ছেন । আম দেখিতে রাস্তা রাস্তা, কাঁকা আলো করিয়া বসে । কাঁচায় বড় টক—পাকিলে স্নিমিষ্ট বটে, কিন্তু তবু হাড়ে টক যায় না । কতকগুলি আম এমন কদর্যা, যে পাকিলেও টক যায় না । কিন্তু দেখিতে বড় বড় রাস্তা রাস্তা হয়, বিক্রেতা ফাঁকি দিয়া পঁচিশ টাকা শ বিক্রয় করিয়া যায় । কতকগুলি আম কাঁচামিটে আছে—পাকিলে পান্শে । কতকগুলি জাঁতে পাকা । সেগুলি কুটিয়া নুন মাখিয়া আমসী করাই ভাল ।

সকলে আম্র খাইতে জানে না । সদ্য গাছ হইতে পাড়িয়া এ ফল খাইতে নাই । ইহা কিয়ৎক্ষণ সেলাম-জলে ফেলিয়া ঠাণ্ডা করিও—যদি ঘোটে, তবে সে জলে একটু খোসামোদ-বরফ দিও—বড় শীতল হইবে । তার পরে ছুরি চালাইয়া স্বচ্ছন্দে খাইতে পার ।

স্বীলোকদিগকে লৌকিক কথায় কলা গাছের

সহিত তুলনা করিয়া থাকে । কিন্তু সে গেছো কথা । কদলী ফলের সঙ্গে ভুবনমোহিনী জাতির আমি সৌন্দর্য্য দেখি না । জ্বীলোক কি কাঁদি কাঁদি ফলে ? যাহার ভাগ্যে ফলে ফলুক—কমলাকান্তের ভাগ্যে ত নয় । কদলীর সঙ্গে কামিনীগণের এই পর্য্যন্ত সাদৃশ্য আছে যে, উভয়েই বানরের প্রিয় । কামিনীগণের এ গুণ থাকিলেও কদলীর সঙ্গে তাঁহাদিগের তুলনা করিতে পারি না । পক্ষান্তরে কতকগুলি কটুভাষী আছেন, তাঁহারা ফলের মধ্যে মাকাল ফলকেই যুবতীগণের অনুরূপ বলেন । যে বলে, সে দুর্মুখ—আমি ইঁহাদিগের ভৃত্য স্বরূপ ; আমি তাহা বলিব না ।

আমি বলি, রমণীমণ্ডলী এ সংসারের নারিকেল । নারিকেলও কাঁদি কাঁদি ফলে বটে, কিন্তু (ব্যবসায়ী নহিলে) কেহ কখন কাঁদি কাঁদি পাড়ে না । কেহ কখন ছাদশীর পারণার অনুরোধে, অথবা বৈশাখ মাসে ব্রাহ্মণসেবার জন্য একটি আধটি পাড়ে । কাঁদি কাঁদি পাড়িয়া থাওয়ার অপরাধে যদি কেহ অপরাধী থাকে, তবে সে

কুলীন ব্রাহ্মণেরা । কমলাকান্ত কখন সে অপরাধে অপরাধী নহে ।

রক্ষের নারিকেলের ন্যায় সংসারের নারিকেলের বয়োভেদে নানাবস্থা । করকচি বেলা উভয়েই বড় স্নিগ্ধকর—নারিকেলের জলে উদর স্নিগ্ধ হয়—কিশোরীর অকৃত্রিম বিলাস-লক্ষণ-শূন্য প্রণয়ে হৃদয় স্নিগ্ধ হয় । কিন্তু দুই জাতীয়,—ফল জাতীয় এবং মনুষ্য জাতীয় নারিকেলের ডাবই ভাল । তখন দেখিতে কেমন উজ্জ্বল শ্যাম—কেমন জ্যোতিঃপুঞ্জ, রৌদ্র তাহা হইতে প্রতিহত হইতেছে—যেন সে নবীন শ্যাম শোভায় জগতের রৌদ্র শীতল হইতেছে । গাছের উপর কাঁদি কাঁদি নারিকেল, আর গবাক্ষপথে কাঁদি কাঁদি যুবতী, আমার চক্ষে একই দেখায়—উভয়ই চতুর্দিক্ আলো করিয়া থাকে । কিন্তু দেখ—দেখিয়া ভুলিও না—এই চৈত্র মাসের রৌদ্র, গাছ হইতে পাড়িয়া ডাব কাটিও না—বড় তপ্ত । সংসারশিক্ষাশূন্য কামিনীকে সহসা হৃদয়ে গ্রহণ করিও না—তোমার কলিজা পুড়িয়া যাইবে । আমের ন্যায়, ডাবকেও বরফ-জলে

রাখিয়া শীতল করিও—বরফ না ঘোটে, পুকুরের
পাঁকে পুঁতিয়া রাখিয়া ঠাণ্ডা করিও—মিষ্ট কথায়
আয়ত্ত না করিতে পার, কমলাকান্ত চক্রবর্তীর
আজ্ঞা, কড়া কথায় করিও ।

নারিকেলের চারিটি সামগ্রী—জল, শস্য,
মালা আর ছোবড়া । নারিকেলের জলের সঙ্গে
স্ত্রীলোকের স্নেহের আমি সাদৃশ্য দেখি । উভয়ই
বড় স্নিগ্ধকর । যখন তুমি সংসারের রৌদ্রে দগ্ধ
হইয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, গৃহের ছায়ায়
বসিয়া বিশ্রাম কামনা কর, তখন এই শীতল জল
পান করিও—সকল যন্ত্রণা ভুলিবে । তোমার
দারিদ্র্য-চৈত্রে, বা বন্ধুবিয়োগ-বৈশাখে—
তোমার যৌবন-মধ্যাহ্নে বা রোগতপ্ত বৈকালে,
আর কিসে তোমার হৃদয় শীতল হইবে ? মাতার
আদর, স্ত্রীর প্রেম, কন্যার ভক্তি. ইহার অপেক্ষা
জীবনের সন্তাপে আর কি সুখের আছে ?
গ্রীষ্মের তাপে ডাবের জলের মত আর
কি আছে ?

তবে, ঝুনো হইলে জল একটু ঝাল হইয়া
যায় । রামার মা ঝুনো হইলে পর, রামার বাপ

ঝালের চোটে বাড়ী ছাড়িয়াছিল । এই জন্য নারিকেলের মধ্যে ডাবেরই আদর ।

নারিকেলের শস্য, স্ত্রীলোকের বুদ্ধি । কর-কচি বেলায় বড় থাকে না ; ডাবের অবস্থায় বড় সুমিষ্ট, বড় কোমল ; ঝুনোর বেলায় বড় কঠিন, দন্তক্ষুট করে কার সাধ্য ? তখন ইহাকে গৃহিণী-পনা বলে । গৃহিণীপনা রসাল বটে, কিন্তু দাঁত বসে না । এক দিকে, কন্যা বসিয়া আছেন, মায়ের অলঙ্কারের বাস্তু হইতে কিয়দংশ সংগ্রহ করিবেন,—কিন্তু ঝুনোর শস্য এমনি কঠিন যে, মেয়ের দাঁত বসিল না—ঝুনো, দয়া করিয়া একটি মাকড়ি বাহির করিয়া দিল । হয় ত পুত্র বসিয়া আছেন, মায়ের নগদ পুঁজির উপর দাঁত বসাইবেন,—ঝুনো, দয়া করিয়া নগদ সাত সিকা বাহির করিয়া দিল । স্বামী, প্রাচীন বয়সে একটি ব্যবসায় ফাঁদিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু শেষ বয়সে হাত খালি—টাকা নহিলে ব্যবসায় হয় না—ঝুনোর পুঁজির উপর দৃষ্টি । দুই চারিটি প্রবৃত্তিরূপ দন্ত ফুটাইয়া দিলেন—বুড়া বয়সের দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল । শেষ যদি দাঁত বসিল,

নারিকেল জীর্ণ করিবার সাধ্য কি ? যত দিন না টাকা ফিরাইয়া দেন, তত দিন অজীর্ণ রোগে রাতে নিদ্রা হয় না ।

তার পরে মালা—এটি স্ত্রীলোকের বিদ্যা—কখন আধখানা বৈ পূরা দেখিতে পাইলাম না । নারিকেলের মালা বড় কাজে লাগে না ; স্ত্রীলোকের বিদ্যাও বড় নয় । মেরি সমরবিল্ বিজ্ঞান লিখিয়াছেন, জেন্ অষ্টেন্ উপন্যাস লিখিয়াছেন—মন্দ হয় নাই, কিন্তু দুই মালার মাপে ।

ছোব্‌ড়া, স্ত্রীলোকের রূপ । ছোব্‌ড়া যেমন নারিকেলের বাহ্যিক অংশ, রূপও স্ত্রীলোকের বাহ্যিক অংশ । দুই বড় অসার ;—পরিত্যাগ করাই ভাল । তবে ছোবড়ায় একটি কাজ হয়—উত্তম রজ্জু প্রস্তুত হয়, তাহাতে জাহাজ বাঁধা যায় । স্ত্রীলোকের রূপের কাছিতেও অনেক জাহাজ বাঁধা গিয়াছে । তোমরা যেমন নারিকেলের কাছিতে জগন্নাথের রথ টান, স্ত্রীলোকেরা রূপের কাছিতে কত ভারি ভারি মনোরথ টানে । যখন রথ-টানা বারণের আইন হইবে,—তখন তাহাতে

এ রথ-টানা নিষেধের জন্য যেন একটা ধারা থাকে—তাহা হইলে অনেক নরহত্যা নিবারণ হইবে। আমি জানি না, নারিকেলের রজ্জু গলায় বাঁধিয়া কেহ কখন প্রাণত্যাগ করিয়াছে কি না, কিন্তু রমণীর রূপরজ্জু গলায় বাঁধিয়া কত লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কে তাহার গণনা করিবে ?

বৃক্ষের নারিকেল এবং সংসারের নারিকেলের সঙ্গে, আমার বিবাদ এই যে, আমি হতভাগা, দুইয়ের এককেও আহরণ করিতে পারিলাম না। অন্য ফল আকর্ষণ দিয়া পাড়া যায়, কিন্তু নারিকেল গাছে না উঠিলে পাড়া যায় না। গাছে উঠিতে গেলেও হয় নিজের পায়ে দড়ি বাঁধিতে হইবে, না হয় ডোমের খোসামোদ করিতে হইবে।*

ডোমের খোসামোদ করিতেও রাজি আছি। কিন্তু আমার ভাগ্যদোষে কপালে নারিকেল

* কমলাকান্ত বোধ হয়, পুরোহিতকে ডোম বলিতেছে, কেন না পুরোহিতেই বিবাহ দেয়। উঃ কি পাষণ্ড!—

ঘোটে না । আমি যেমন মানুষ, তেমনি গাছে তেমনি রূপগুণের আকর্ষণ দিয়া নারিকেল পাড়িতে পারি । পারি, কিন্তু ভয় পাছে নারিকেল ঘাড়ে পড়ে । এমন অনেক শ্যামী, বামী, রামী, কামিনী আছে, যে কমলাকান্তকেও স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে । কিন্তু পরের মেয়ে ঘাড়ে করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে, এ দীন অসমর্থ । অতএব এ যাত্রা, কমলাকান্ত ভক্তিভাবে, নারিকেল ফলটি বিশেষরূপে দিলেন । তিনি একে শ্মশানবাসী, তাহাতে আবার বিষপান করিয়াছেন—ছাই ডাব নারিকেলের তাঁহার কি করিবে ?

এ দেশে এক জাতি লোক সম্প্রতি দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা দেশহিতৈষী বলিয়া খ্যাত । তাঁহাদের আমি শিমুল ফুল ভাবি । যখন ফুল ফুটে, তখন দেখিতে শুনিতে বড় শোভা—বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা, গাছ আলো করিয়া থাকে । কিন্তু আমার চক্ষে নেড়া গাছে অত রাঙ্গা ভাল দেখায় না । একটু একটু পাতা ঢাকা থাকিলে ভাল দেখাইত ; পাতার মধ্য হইতে যে অল্প

অল্প রাঙ্গা দেখা যায়, সেই সুন্দর । ফুলে গন্ধ
 মাত্র নাই—কোমলতা মাত্র নাই, কিন্তু তবু
 ফুল বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা । যদি ফুল ঘুচিয়া,
 ফল ধরিল, তখন মনে করিলাম, এই বার কিছু
 লাভ হইবে । কিন্তু তাহা বড় ঘটে না । কাল-
 ক্রমে চৈত্র মাস আসিলে রৌদ্রের তাপে, অন্ত-
 র্গু ফল, ফট করিয়া ফাটিয়া উঠে ; তাহার
 ভিতর হইতে খানিক তূলা বাহির হইয়া বঙ্গ-
 দেশময় ছড়িয়া পড়ে !

অধ্যাপক ব্রাহ্মাঙ্গণ সংসারের ধুতুরা ফল ।
 বড় বড় লম্বা লম্বা সমাসে, বড় বড় বচনে,
 তাহাদিগের অতি সুদীর্ঘ কুসুম সকল প্রস্ফুটিত
 হয়, ফলের বেলা কণ্টকময় ধুতুরা । আমি
 অনেক দিন হইতে মানস করিয়াছি যে, কুকুট-
 মাংস ভোজন করিয়া হিন্দুজন্ম পবিত্র করিব—
 কিন্তু এই অধম ধুতুরাগুলার কাঁটার জ্বালায়,
 পারিলাম না । গুণের মধ্যে এই যে, এই ধুতু-
 রায় মাদকের মাদকতা রুদ্ধ করে । যে গাঁজা-
 খোরের গাঁজায় নেশা হয় না, তাহার গাঁজার
 সঙ্গে দুইটা ধুতুরার বীচি সাজিয়া দেয়—যে

সিদ্ধিখোরের সিদ্ধিতে নেশা না হয়, তাহার সিদ্ধির সঙ্গে দুইটা ধুতুরার বীচি বাটিয়া দেয় । বোধ হয় এই হিসাবেই, বঙ্গীয় লেখকেরা আপনাপন প্রবন্ধমধ্যে অধ্যাপকদিগের নিকট দুই চারিটা বচন লইয়া গাঁথিয়া দেন । প্রবন্ধ-গাঁজার মধ্যে সেই বচন-ধুতুরার বীচিতে পাঠকের নেশা জমাইয়া তুলে । এই নেশায় বঙ্গ-দেশ আজি কালি মাতিয়া উঠিয়াছে ।

আমাদের দেশের লেখকদিগকে আমি তেঁতুল বলিয়া গণি । নিজের সম্পত্তি খোলা আর সিটে, কিন্তু দুগ্ধকেও স্পর্শ করিলে দধি করিয়া তোলেন । গুণের মধ্যে কেবল অম্লগুণ—তাও নিকৃষ্ট অম্ল । তবে এক গুণ মানি—ইঁহারা সান্ধাং কাষ্ঠাবতার । তেঁতুল কাঠ নীরস বটে, কিন্তু সমালোচনার আগুনে পোড়েন ভাল । সত্য কথা বলিতে কি, তেঁতুলের মত কুসামগ্রী আমি সংসারে দেখিতে পাই না । যেই কিয়ৎ পরিমাণে খায়, তাহারই অজীর্ণ হয়, সেই অম্ল উদ্গার করে । যেই অধিক পরিমাণে খায়, সেই অম্লপিত্তরোগে চিরক্লম্ব । ঝাঁহারা

সাহেব হইয়াছেন, টেবিলে বসিয়া, গ্যাসের আলোতে, বা আর্গাণ্ড জ্বালিয়া, ফয়জু খানসামার হাতের পাক, কাঁটা চামচে ধরিয়া খাইতে শিথিয়াছেন—তাহারা এক দায় এড়াইয়াছেন—
 তেঁতুলের অল্পের বড় ধার ধারিতে হয় না—
 আগা গোড়া তেঁতুলের মাছ দিয়া ভাত মারিতে হয় না। কিন্তু ঝাঁহাদিগকে চালা-ঘরে বসিয়া, মুশ্বেরে পাতর কোলে করিয়া, পদী পিসীর রান্না খাইতে হয়, তাহাদের কি যন্ত্রণা! পদী পিসী কুলীনের মেয়ে, প্রাতঃস্নান করে, নামাবলী গায়ে দেয়, হাতে তুলসীর মালা, কিন্তু রাঁধিবার বেলা কলাইয়ের দাল, আর তেঁতুলের মাছ ছাড়া আর কিছুই রাঁধিতে জানেন না। ফয়জু জাতিতে নেড়ে, কিন্তু রাঁধে অমৃত!

আর একটি মনুষ্যফলের কথা বলা হইলেই অদ্য ক্ষান্ত হই। দেশী হাকিমেরা কোন্ ফল বল দেখি? যিনি রাগ করেন করুন, আমি স্পষ্ট কথা বলিব, ইহার পৃথিবীর কুস্মাণ্ড। যদি চালে তুলিয়া দিলে, তবেই ইহার উঁচুতে ফলিলেন—নহিলে মাটিতে গড়াগড়ি

যান । যেখানে ইচ্ছা সেখানে তুলিয়া দাও, একটু ঝড় বাতাসেই লতা ছিঁড়িয়া ভূমে গড়াগড়ি । অনেকগুলি রূপেও কুম্ভাণ্ড, গুণেও কুম্ভাণ্ড ।—তবে কুম্ভাণ্ড এখন দুই প্রকার হইতেছে—দেশী কুম্ভাণ্ড ও বিলাতি কুম্ভাণ্ড । বিলাতি কুম্ভাণ্ড বলিলে এমত বুঝায় না, যে, এই কুম্ভাণ্ডগুলি বিলাত হইতে আসিয়াছে । যেমন দেশী মুচির তৈয়ারি জুতাকে ইংরাজি জুতা বলে, ইঁহারাও সেই রূপ বিলাতি । বিলাতি কুম্ভাণ্ডর যে গৌরব অধিক ইঁহা বলা বাহুল্য । সংসারোদ্যানে আরও অনেক ফল ফলে, তন্মধ্যে সর্বাশেষে অকর্মণ্য, কদর্য্য, টক—

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী ।

তৃতীয় সংখ্যা ।

ইউটিলিটি*

বা

উদর-দর্শন ।

বেঙ্হাম হিতবাদ দর্শনের সৃষ্টি করিয়া ইউ-
রোপে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন ।

* “ইউটিলিটি” শব্দের অর্থ কি? ইহার কি বাঙ্গালা
নাই? আমি নিজে ইংরেজি জানি না—কমলাকান্তও
কিছু বলিয়া দেয় নাই—অতএব অগত্যা আমার পুত্রকে
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমার পুত্র, তেজনারী দেখিয়া
এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছে—“ইউ” শব্দে তুমি বা তোমরা,
“টিল্” শব্দে চাষ করা, “ইট্” শব্দে খাওয়া, “ই”
অর্থে কি তাহা সে বলিতে পারিল না, কিন্তু বোধ করি
কমলাকান্ত, “ইউ-টিল-ইট-ই” পদে ইহাই অভিপ্রেত
করিয়াছেন যে, “তোমরা চাষ করিয়াই খাও।” কি
পাষও! সকলকেই চাষা বলিল! ঐদৃশ দুর্বৃত্ত দর্শানন
লম্বোদর গজাননের রচনা পাঠ করাতেও পাপ আছে।

আমি এই হিতবাদ মতে অমত করি না ; বরং আমি ইহার অনুমোদক, তবে, আপনারা জানেন কি না বলিতে পারি না, আমি এক জন সুযোগ্য দার্শনিক । আমি এই হিতবাদ দর্শন অবলম্বন করিয়া, কিছু ভাঙ্গিয়া, কিছু গড়িয়া, একটি নূতন দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি । প্রকৃত পক্ষে, তাহা বাঙ্গালায় প্রচলিত হিতবাদ দর্শনের নূতন ব্যাখ্যা মাত্র । তাহার স্কুল মর্মে আমি সংক্ষেপতঃ লিপিবদ্ধ করিতেছি । প্রাচীন প্রথানুসারে দর্শনটি সূত্রাকারে লিখিত হইয়াছে । এবং আমি স্বয়ংই সূত্রের ভাষ্য করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়াছি । বাঙ্গালাতেই সূত্রগুলি লিখিত হইয়াছে । আমি যে অসংস্কৃত, এমত কেহ মনে করিবেন না । তবে সংস্কৃতে সূত্রগুলি কয় জন বুঝিতে পারিবে ? অতএব, সাধারণ পাঠকের প্রতি অনুকূল হইয়া বাঙ্গা-

বোধ হয়, আমার পুস্তকটি ইংরেজি লেখা পড়ায় ভাল হইয়াছে, নচেৎ এরূপ দুর্কহ শব্দের সদর্থ করিতে পারিত না ।—শ্রীভীষ্মদেব খোষনবীশ ।

নাতেই সমস্ত কার্য নির্বাহ করিয়াছি । সে
নৃত্র-গ্রন্থের সারাংশ এই ;—

১। জীবশরীরস্থ বৃহৎ গহ্বর বিশেষকে
উদর বলে ।

ভাষ্য ।

“বৃহৎ”—অর্থাৎ নাসিকা কর্ণাদি ক্ষুদ্র গহ্বরকে উদর
বলা যায় না । বলিলে, বিশেষ প্রত্যয় আছে ।

“জীবশরীরস্থ বৃহৎ গহ্বর”—জীবশরীরস্থ বলিবার
তাৎপর্য এই যে, নহিলে পর্বতগুহা প্রভৃতিকে উদর
বলিয়া পরিচয় দিয়া কেহ তাহার পূর্তির প্রত্যাশা করিতে
পারেন ।

“গহ্বর”—যদিও জীবশরীরস্থ গহ্বর বিশেষই উদর
শব্দে বাচ্য, তথাপি অবস্থা বিশেষে অঞ্জলি প্রভৃতিও
উদর মধ্যে গণ্য । কোন স্থানে উদর পুরাইতে হয়,
কোন স্থানে অঞ্জলি পুরাইতে হয় ।

২। উদরের ত্রিবিধ পূর্তিই পরম
পুরুষার্থ ।

ভাষ্য ।

সাংখ্যেরও এই মত । আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক,
এবং আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ উদর-পূর্তি ।

“আধিভৌতিক”—অন্ন ব্যঞ্জন সন্দেশ মিষ্টান্ন প্রভৃতি

ভৌতিক সামগ্রীর দ্বারা উদরের যে পূর্তি হয়, তাহাই আধিভৌতিক পূর্তি ।

“আধ্যাত্মিক”—যাঁহারা বড়লোকের বাক্যে লুপ্ত হইয়া, আশায় বন্ধ হইয়া, কালযাপন করেন, তাঁহাদিগেরও আধ্যাত্মিক উদরপূর্তি হয় ।

“আধিদৈবিক”—দৈবানুকম্পার প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি দ্বারা যাঁহাদের উদর পূরিতা উঠে, তাঁহাদিগের আধিদৈবিক উদরপূর্তি ।

৩। এতন্মধ্যে আধিভৌতিক পূর্তিই বিহিত ।

ভাষা ।

“বিহিত”—বিহিত শব্দের দ্বারা অন্যান্য পূর্তির প্রতিষেধ হইল কি না, ভবিষ্যৎ ভাষ্যকারেরা মীমাংসা করিবেন ।

এক্ষণে সিদ্ধ হইল যে, উদরনামক মহা-গহ্বরে লুচি সন্দেশ প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থের প্রবেশই পুরুষার্থ । অতএব এ গহ্বরের মধ্যে কি প্রকার ভূত প্রবেশ করান যাইতে পারে, তাহা নির্বাচন করা যাইতেছে ।

৪। বিদ্যা, বুদ্ধি, পরিশ্রম, উপাসনা, বল, এবং প্রতারণা এই ষড়্‌বিধ পুরুষার্থের উপায়, পূর্বপণ্ডিতেরা নির্দেশ করিয়াছেন ।

ভাষা ।

১। “বিদ্যা”—বিদ্যা কি, তাহা অবধারণ করা কঠিন ।

কেহ কেহ বলেন, লিখিতে ও পড়িতে শিখাকে বিদ্যা বলে । কেহ কেহ বলেন, বিদ্যার জন্য বিশেষ লিখিতে বা পড়িতে শিখার প্রয়োজন নাই, গ্রন্থ লিখিতে, সম্বাদ পত্রাদিতে লিখিতে জানিলেই হইল । কেহ কেহ তাহাতে আপত্তি করেন যে, যে লিখিতে জানে না, সে পত্রাদিতে লিখিবে কি প্রকারে ? আমার বিবেচনার একরূপ তর্ক নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর । কুস্তুরশাবক ডিম্ব ভেদ করিবার মাত্র জলে গিয়া সাঁতার দেয়—অথচ কখন সাঁতার শিখে নাই । সেইরূপ বিদ্যা বাঙ্গালির স্বতঃসিদ্ধ, তজ্জন্তু লেখা পড়া শিখিবার প্রয়োজন নাই ।

২। “বুদ্ধি”—যে আশ্চর্য্য শক্তি দ্বারা তুলাকে লৌহ, লৌহকে তুলা বিবেচনা হয়, সেই শক্তিকে বুদ্ধি বলে । রূপণের সঞ্চিত ধনরশির ন্যায় ইহা আমরা সর্বদা দেখিতে পাই, কিন্তু পরের কখন দেখিতে পাই না । পৃথিবীর সকল সামগ্রীর অপেক্ষা বোধ হয় জগতে ইহারই আধিক্য । কেন না, কখন কেহ বলিল না যে, ইহা আমি অল্প পরিমাণে পাইয়াছি ।

৩। “পরিশ্রম”—উপযুক্ত সময়ে ঈষৎক্ষণ অল্প ব্যঞ্জন ভোজন, তৎপরে নিদ্রা, বায়ু সেবন, তামাকুর ধূমপান, গৃহিণীর সহিত প্রিয় সন্তাষণ ইত্যাদি গুরুতর কার্য্য সম্পাদনের নাম পরিশ্রম ।

৪। “উপাসনা”—কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে, হয় তাহার গুণানুবাদ নয় দোষকীর্তন করিতে হয় । কোন ক্ষমতাশালী প্রধান ব্যক্তি সম্বন্ধে একরূপ কথা হইলে,

যদি তিনি প্রকৃত দোষযুক্ত ব্যক্তি হইলেন, তবে তাঁহার দোষ-
কীর্তন করাকে নিন্দা বলে । আর তিনি যদি দোষযুক্ত না
হইলেন, তবে তাঁহার দোষকীর্তনকে স্পষ্টবক্তৃত্ব অথবা
রসিকতা বলে । গুণ পক্ষে, তিনি যদি গুণহীন হইলেন, তবে
তাঁহার গুণকীর্তনকে ন্যায়নিষ্ঠতা বলে । আর যদি তিনি
যথার্থ গুণবান হইলেন, তবে তাঁহার গুণকীর্তনকে উপাসনা
বলে ।

৫। “বল”—দীর্ঘচ্ছন্দ বাক্য—মুখ চক্ষুর আরক্তভাব—
ঘোরতর ডাক, হাঁক,—মুখ হইতে অনর্গল, হিন্দী, ইংরেজি
এবং নিষ্ঠীবনের রুষ্টি,—দূর হইতে ভঙ্গী দ্বারা কিল, চড়,
ঘুসা, এবং লাথি প্রদর্শন ও সার্কি তিপ্পান্ন প্রকার অন্যান্য অঙ্গ-
ভঙ্গী—এবং বিপক্ষের কোন প্রকার উদ্যম দেখিলে অকালে
পলায়ন ইত্যাদিকে বল বলে ।

বল ষড়্‌বিধ, যথা :—

মৌখিক—অভিসম্পাত, গালি, নিন্দা প্রভৃতি ।

হাস্ত—কিল, চড়, প্রদর্শন প্রভৃতি ।

পাদ—পলায়নাদি ।

চাক্ষুষ—রোদনাদি । যথা, চাণক্যপণ্ডিত,—“বালানাং
রোদনং বলং” ইত্যাদি ।

ত্বাচ—প্রহার সহিষ্ণুতা ইত্যাদি ।

মানস—দ্বेष, ঈর্ষা, হিংসা প্রভৃতি ।

৬। “প্রতারণা”—নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের পৃথিবীমধ্যে
প্রতারক বলিয়া জানিও,

এক, পণ্যাজীব । প্রমাণ—দোকানদার জিনিষ বেচিয়া,

আবার মূল্য চাহিয়া থাকে। মূল্যদাতা মাত্রেই মত যে, তিনি ক্রয়কালীন প্রতারিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয়, চিকিৎসক। প্রমাণ—রোগী রোগ হইতে মুক্ত হইলে পরে যদি চিকিৎসক বেতন চায়, তবে রোগী প্রায় সিন্ধাস্ত করিয়া থাকেন যে, আমি নিজে আরাম হইয়াছি; এ বেটা অনর্থক ফাঁকি দিয়া টাকা লইতেছে।

তৃতীয়, ধর্মোপদেষ্টা এবং ধার্মিক ব্যক্তি। ইহারা চিরপ্রথিত প্রতারক, ইহাদিগের নাম “ভণ্ড”। ইহারা যে প্রতারক, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, ইহারা অর্থাতির কামনা করেন না।

ইত্যাদি।

৫। এই ষড়্ বিধ উপায়ের দ্বারা উদরপূর্তি বা পুরুষার্থ অসাধ্য।

ভাষা।

এই সূত্রের দ্বারা পূর্বপণ্ডিতদিগের মত খণ্ডন করা যাইতেছে। বিদ্যাদি ষড়্ বিধ উপায়ের দ্বারা যে উদরপূর্তি হইতে পারে না, ক্রমে তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

“বিদ্যা”—বিদ্যাতে যদি উদরপূর্তি হইত, তবে বাঙ্গালা সম্বাদপত্রের অন্নাভাব কেন?

‘বুদ্ধি’—বুদ্ধিতে যদি উদরপূর্তি হইত, তবে গর্দভ মোট বহিবে কেন?

“পরিশ্রম”—পরিশ্রমে যদি হইত, তবে বাঙ্গালি বাকুয়া কেরণী কেন?

“উপাসনা”—উপাসনায় যদি হইত, তবে সাহেবগণ কমলাকান্তকে অনুগ্রহ করেন না কেন? আমি ত মন্দ পেন্সিল লিখি নাই।

“বল”—বলে যদি হইত, তবে আমরা পড়িয়া মার খাই কেন?

“প্রতারণা”—প্রতারণায় যদি হইত, তবে মদের দোকান কখন কখন ফেল হয় কেন?

৬। উদরপূর্তি বা পুরুষার্থ কেবল হিত-সাধনের দ্বারা সাধ্য।

ভাষা।

উদাহরণ। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা লোকের কানে মন্ত্র দিয়া তাহাদের হিতসাধন করিয়া থাকেন। ইউরোপীয় জাতিগণ অনেক বন্যজাতির হিতসাধন করিয়াছেন, এবং রুসেরা এক্ষণে মধ্য-আসিয়ার হিতসাধনে নিযুক্ত আছেন। বিচারকগণ বিচার করিয়া দেশের হিতসাধন করিতেছেন। অনেকে সুবিক্রেয় এবং অবিক্রেয় পুস্তক ও পত্রাদি প্রণয়ন দ্বারা দেশের হিতসাধন করিতেছেন। এ সকলের প্রচুর পরিমাণে উদরপূর্তি অর্থাৎ পুরুষার্থলাভ হইতেছে।

৭। অতএব সকলে দেশের হিতসাধন কর।

ভাষা।

এই শেষ সূত্রের দ্বারা হিতবাদ দর্শন, এবং উদর দর্শনের একতা প্রতিপাদিত হইল। সুতরাং এই স্থলে কমলা-

কান্তের সূত্র-গ্রন্থের সমাপ্তি হইল । ভরসা করি, ইহা ভারত-
বর্ষের সপ্তম দর্শনশাস্ত্র খলিয়া আদৃত হইবে ।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী ।

চতুর্থ সংখ্যা ।

পতঙ্গ ।

বাবুর বৈঠকখানায় সেজ জ্বলিতেছে—
পাশে আমি, মোসায়েবি ধরণে বসিয়া আছি।
বাবু দলাদলির গল্প করিতেছেন,— আমি
আফিম চড়াইয়া ঝিমাইতেছি। দলাদলিতে
চটিয়া, মাত্রা বেশী করিয়া ফেলিয়াছি।
লাচার! বিধিলিপি! এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অনাদি
ক্রিয়া পরম্পরার একটি ফল এই যে, উনবিংশ
শতাব্দীতে কমলাকান্ত চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করিয়া
অদ্য রাত্রে নসীরাম বাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া
মাত্রা বেশী করিয়া ফেলিবেন। সুতরাং আমার
সাধ্য কি যে, তাহার অন্যথা করি।

ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিলাম যে, একটা
পতঙ্গ আসিয়া, ফানুষের চারি পাশে শব্দ

করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । “চোঁ-ও-ও-ও”
 “বেঁ-ও-ও” করিয়া শব্দ করিতেছে । আফি-
 মের ঝোঁকে মনে করিলাম, পতঙ্গের ভাষা
 কি বুঝিতে পারি না ? কিছুক্ষণ কান পাতিয়া
 শুনিলাম—কিছু বুঝিতে পারিলাম না । মনে
 মনে পতঙ্গকে বলিলাম, “তুমি কি ও চোঁ
 বেঁ করিয়া বলিতেছ, আমি কিছু বুঝিতে
 পারিতেছি না ।” তখন হঠাৎ আফিম প্রসা-
 দাৎ দিব্য কর্ণ প্রাপ্ত হইলাম—শুনিলাম,
 পতঙ্গ বলিল, “আমি আলোর সঙ্গে কথা
 কহিতেছি—তুমি চুপ কর ।” আমি তখন
 চুপ করিয়া পতঙ্গের কথা শুনিতে লাগিলাম ।
 পতঙ্গ বলিতেছে—

দেখ, আলো মহাশয়, তুমি সে কালে ভাল
 ছিলে—পিতলের পিলস্জের উপর মেটে
 প্রদীপে শোভা পাইতে—আমরা স্বচ্ছন্দে পু-
 ডিয়া মরিতাম । এখন আবার সেজের ভিতর
 ঢুকিয়াছ—আমরা চারি দিকে ঘুরে বেড়াই—
 প্রবেশ করিবার পথ পাই না, পুড়িয়া মরিতে
 পাই না ।

দেখ, পুড়িয়া মরিতে আমাদের রাইট আছে—আমাদের চিরকালের হক্ । আমরা পতঙ্গজাতি, পূর্বাপর আলোতে পুড়িয়া মরিয়া আসিতেছি—কখন কোন আলো আমাদের বারণ করে নাই । তেলের আলো, বাতির আলো, কাঠের আলো, কোন আলো কখন বারণ করে নাই । তুমি কাচ মুড়ি দিয়া আছ কেন, প্রভু ? আমরা গরিব পতঙ্গ—আমাদের উপর সহমরণ নিষেধের আইন জারি কেন ? আমরা কি হিন্দুর মেয়ে যে, পুড়িয়া মরিতে পাব না ?

দেখ, হিন্দুর মেয়ের সঙ্গে আমাদের অনেক প্রভেদ । হিন্দুর মেয়েরা আশা ভরসা থাকিতে কখন পুড়িয়া মরিতে চাহে না—আগে বিধবা হয়, তবে পুড়িয়া মরিতে বসে । আমরাই কেবল সকল সময়ে আত্মবিসর্জনে ইচ্ছুক । আমাদের সঙ্গে স্ত্রীজাতির তুলনা ?

আমাদিগের ন্যায়, স্ত্রীজাতিও রূপের শিখা জ্বলিতে দেখিলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে বটে । ফলও

এক,—আমরাও পুড়িয়া মরি, তাহারাও পুড়িয়া মরে। কিন্তু, দেখ, সেই দাহতেই তাদের সুখ, —আমাদের কি সুখ ? আমরা কেবল পুড়িবার জন্য পুড়ি, মরিবার জন্য মরি। দ্বীজাতিতে পারে ? তবে আমাদের সঙ্গে তাহাদের তুলনা কেন ?

শুন, যদি জ্বলন্ত রূপে শরীর না ঢালি-লাম, তবে এ শরীর কেন ? অন্য জীবে কি ভাবে, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আমরা পতঙ্গজাতি, আমরা ভাবিয়া পাই না, কেন এ শরীর ?—লইয়া কি করিব ?—নিত্য নিত্য কুসুমের মধু চুম্বন করি, নিত্য নিত্য বিশ্ব-প্রফুল্লকর সূর্য্যকিরণে বিচরণ করি—তাহাতে কি সুখ ? ফুলের সেই একই গন্ধ, মধুর সেই একই মিষ্টতা, সূর্য্যের সেই এক প্রকারই প্রতিভা। এমন অসার, পুরাতন বৈচিত্র্যশূন্য জগতে থাকিতে আছে ? কাচের বাহিরে আইস, জ্বলন্ত রূপশিখায় গা ঢালিব।

দেখ, আমার ভিক্ষাটি বড় ছোট—আমার প্রাণ, তোমাকে দিয়া যাইব, লইবে না ? দিব

বৈ ত গ্রহণ করিব না। তবে ক্ষতি কি? তুমি রূপ, পোড়াইতে জন্মিয়াছ, আমি পতঙ্গ, পুড়িতে জন্মিয়াছি; আইস, যার যে কাজ, করিয়া যাই। তুমি হাসিতে থাক, আমি পুড়ি।

তুমি বিশ্বধ্বংসক্ষম—তোমাকে রোধিতে পারে, জগতে এমন কিছুই নাই—তুমি কাচের ভিতর লুকাইয়াছ কেন? তুমি জগতের গতির কারণ—কার ভয়ে তুমি ডোমের ভিতর লুকাইয়াছ? কোন্ ডোমে এ ডোম গড়িয়াছে? কোন্ ডোমে তোমাকে এ ডোমের ভিতর পুরিয়াছে? তুমি যে বিশ্বব্যাপী, কাচ ভাঙ্গিয়া আমায় দেখা দিতে পার না?

তুমি কি? তা আমি জানি না—আমি জানি না—কেবল জানি যে, তুমি আমার বাসনার বস্তু—আমার জাগ্রতের ধ্যান—নিদ্রার স্বপ্ন—জীবনের আশা—মরণের আশ্রয়। তোমাকে কখন জানিতে পারিব না—জানিতে চাহিও না—যে দিন জানিব, সেই দিন আমার সুখ যাইবে। কাম্য-বস্তুর স্বরূপ জানিলে কাহার সুখ থাকে?

তোমাকে কি পাইব না? কত দিন তুমি

কাচের ভিতর থাকিবে? আমি কাচ ভাঙ্গিতে পারিব না? ভাল থাক—আমি ছাড়িব না—
আবার আসিতেছি—বোঁ।—ও—ও

পতঙ্গ উড়িয়া গেল।

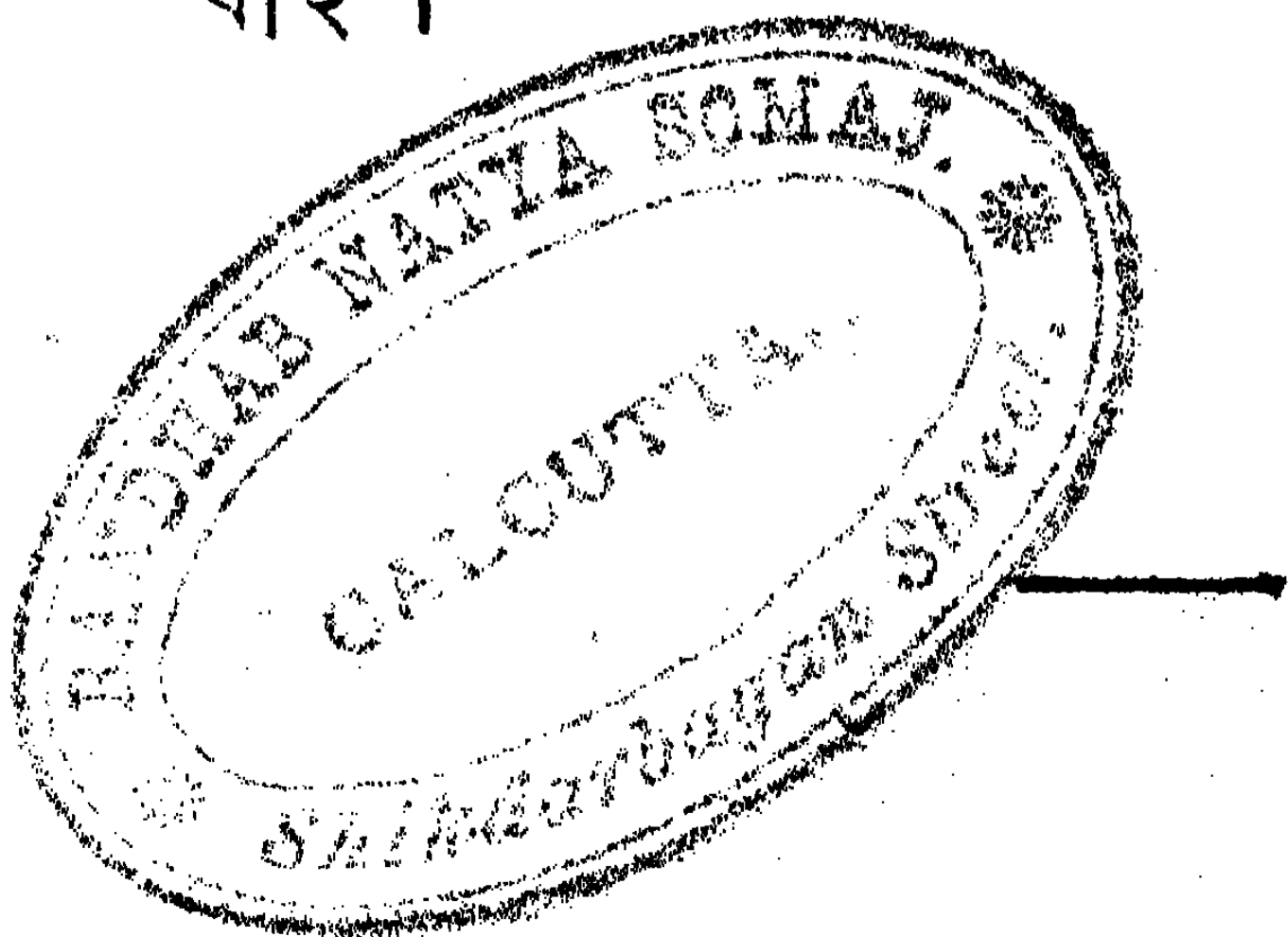
নসীরাম বাবু ডাকিল, “কমলাকান্ত!”
আমার চমক হইল—চাহিয়া দেখিলাম—বুঝি
বড় ঢুলিয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু চাহিয়া
দেখিয়া নসীরামকে চিনিতে পারিলাম না—
দেখিলাম, মনে হইল একটা বৃহৎ পতঙ্গ
বালিশ ঠেসান দিয়া, তামাকু টানিতেছে। সে
কথা কহিতে লাগিল—আমার বোধ হইতে
লাগিল যে, সে চেঁ। বোঁ করিয়া কি বলিতেছে।
এখন হইতে আমার বোধ হইতে লাগিল যে,
মনুষ্য মাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি
বহি আছে—সকলেই সেই বহিতে পুড়িয়া
মরিতে চাহে—সকলেই মনে করে, সেই বহিতে
পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে—কেহ
মরে, কেহ কাচে বাঁধিয়া ফিরিয়া আসে।
জ্ঞান-বহি, ধন-বহি, মান-বহি, রূপ-বহি, ধর্ম-

বহি, ইন্দ্রিয়-বহি, সংসার বহিময় । আবার সংসার কাচময় । যে আলো দেখিয়া মোহিত হই—মোহিত হইয়া যাহাতে কাঁপ দিতে যাই—কই, তাহা ত পাই না—আবার ফিরিয়া বেঁ। করিয়া চলিয়া যাই—আবার আসিয়া ফিরিয়া বেড়াই । কাচ না থাকিলে, সংসার এত দিন পুড়িয়া যাইত । যদি সকল ধর্মবিৎ চৈতন্য-দেবের ন্যায় ধর্ম মানসপ্রত্যক্ষে দেখিতে পাইত, তবে কয় জন বাঁচিত ? অনেকে জ্ঞান-বহির আবরণ-কাচে ঠেকিয়া রক্ষা পায়, সক্রেতিস্, গেলিলিও তাহাতে পুড়িয়া মরিল । রূপ-বহি, ধন-বহি, মান-বহিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে,—আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি । এই বহির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি । মহাভারতকার মান-বহি সৃজন করিয়া দুর্ষোধন পতঙ্গকে পোড়াইলেন ;—জগতে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল । জ্ঞান-বহি-জাত দাহের গীত “Paradise Lost” । ধর্ম-বহির অধিতীয় কবি, সেন্ট পল । ভোগ-বহির পতঙ্গ, “আর্চনি, ক্লিপেত্রা ।” রূপ-বহির “রোমিও

ও জুলিয়েট”, ঈর্ষ্যা-বহির “ওথেলো” । গীত-গোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয়-বহি জ্বলিতেছে । স্নেহ-বহিতে সীতাপতঙ্গের দাহ জন্য রামায়ণের সৃষ্টি ।

বহি কি আমরা জানি না । রূপ, তেজ, তাপ, ক্রিয়া, গতি, এ সকল কথার অর্থ নাই । এখানে দর্শন হারি মানে, বিজ্ঞান হারি মানে । ধর্মপুস্তক হারি মানে, কাব্য গ্রন্থ হারি মানে । ঈশ্বর কি, ধর্ম কি, জ্ঞান কি, স্নেহ কি, তাহা কি ? কিছু জানি না । তবু সেই অলৌকিক, অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি । আমরা পতঙ্গ না ত কি ?

দেখ ভাই, পতঙ্গের দল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোন ফল নাই ! পার, আগুনে পড়িয়া পুড়িয়া মর । না পার, চল, “বোঁ” করিয়া চলিয়া যাই ।



শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী ।

আমার মন ।

আমার মন কোথায় গেল ? কে লইল ? কই, যেখানে আমার মন ছিল, সেখানে ত নাই । যেখানে রাখিয়াছিলাম, সেখানে নাই । কে চুরি করিল ? কই, সাত পৃথিবী খুঁজিয়া ত আমার “মনচোর” কাহাকে পাইলাম না ? তবে কে চুরি করিল ?

এক জন বন্ধু বলিলেন, ‘দেখ, পাকশালা খুঁজিয়া দেখ, সেখানে তোমার মন পড়িয়া থাকিতে পারে । ম্যানি, পাকের ঘরে আমার মন পড়িয়া থাকিত । যেখানে পোলাও, কাবাব, কোফ্তার সুগন্ধ, যেখানে ডেকচী, সমারুড়া অন্নপূর্ণার মৃদু মৃদু ফুটফুট বুটবুট টকবকো ধ্বনি, সেইখানে আমার মন পড়িয়া থাকিত । যেখানে ইলিস মৎস্য, সতৈল অভিষেকের পর ঝোল-গঙ্গায় স্নান করিয়া, মৃগয়, কাংস্রময়, কাচময় বা

রজতময় সিংহাসনে উপবেশন করেন, সেই-
 খানেই আমার মন প্রণত হইয়া পড়িয়া থাকে,
 ভক্তিরসে অভিভূত হইয়া, সেই তীর্থস্থান আর
 ছাড়িতে চায় না । যেখানে ছাগ-নন্দন, দ্বিতীয়
 দধীচির ন্যায়, পরোপকারার্থ আপন অস্থি সম-
 পর্ণ করেন, যেখানে মাংসসংযুক্ত সেই
 অস্থিতে কোরমা রূপ বজ্র নির্মিত হইয়া, ক্ষুধা-
 রূপ বৃত্রাসুর বধের জন্য প্রস্তুত থাকে, আমার
 মন সেইখানেই, ইন্দ্রত্ব লাভের জন্য বসিয়া
 থাকে । যেখানে, পাচকরূপী বিষ্ণুকর্তৃক, লুচি-
 রূপ সুদর্শন চক্র পরিত্যক্ত হয়, আমার মন সেই-
 খানেই গিয়া বিষ্ণুভক্ত হইয়া দাঁড়ায় । অথবা
 যে আকাশে লুচি-চন্দ্রের উদয় হয়, সেইখানেই
 আমার মন-রাহু গিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে চায় ।
 অন্যে যাহাকে বলে বলুক, আমি লুচিকেই অখণ্ড
 মণ্ডলাকার বলিয়া থাকি । যেখানে সন্দেশ রূপ
 শালগ্রামের বিরাজ, আমার মন সেইখানেই
 পূজক । হালদারদিগের বাড়ীর রামমণি
 দেখিতে অতি কুৎসিতা, এবং তাহার বয়ঃক্রম
 ষাট্‌বৎসর, কিন্তু রাঁধে ভাল, এবং পরিবেশনে

মুক্তহস্তা বলিয়া, আমার মন তাহার সঙ্গে প্রসক্তি করিতে চাহিয়াছিল । কেবল রামমণির সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হওয়ায় এটি ঘটে নাই ।

সুহৃদের প্রবর্তনায়, পাকশালায় মনের সন্ধান করিলাম, সেখানে পাইলাম না । পলান্ন-কোফ্তা প্রভৃতি অধিষ্ঠাতৃদেবগণ জিজ্ঞাসায় বলিলেন, তাঁহারা কেহ আমার মন চুরি করেন নাই । দেখিলাম, সুপকার, মাথায় গামছা বাঁধিয়া পাক করিতেছেন—তাঁহাকে যুক্তকরে বলিলাম, “হে প্রভো ! এই যে আকা, উনান, বা চুলার শ্রেণী, ইহাই তোমার যমুনা, এত-মধ্যস্থ তরঙ্গোৎক্ষেপী অগ্নি, সেই যমুনার গঙ্গাদ-নাদী বারিরাশি ; তুমিই কলিকালে শ্রীনন্দনন্দন ; এই হাঁড়ির শোঁশোঁ শব্দ তোমার বংশীরব ; আর তোমার যে মাথায় গামছা বাঁধা, উহা চূড়ার টালনি ; তোমার হাতে যে ভাতের কাটি, ঐ পাচন বাড়ি ; তুমি অনেক গোরু রক্ষা কর, অতএব হে রাখালরাজ ! ভক্তকে সদয় হইয়া বল, আমার মন কোথা ? তুমি কি চুরি করিয়াছ ?” রাখালরাজ বলিলেন, “আমি তোমার

মনোহরণ করি নাই, দেখ আমার খিচুড়ির হাঁড়ি
অঁকিয়া গিয়াছে ।”

বন্ধু বলিলেন, এক বার প্রসন্ন গোয়ালিনীর
নিকট সন্ধান জান । প্রসন্নের সঙ্গে আমার একটু
প্রণয় ছিল বটে, কিন্তু সে প্রণয়টা কেবল গব্য-
রসাত্মক । তবে প্রসন্ন দেখিতে শুনিতে মোটা-
মোটা, গোলগাল, বয়সে চল্লিশের নীচে,
দাঁতে মিসি, হাসিভরা মুখ, কপালের একটি
ছোট উল্কা টিপের মত দেখাইত ; সে,
রসের হাসি পথে ছড়াইতে ছড়াইতে যাইত,
আমি তাহা কুড়াইয়া লইতাম, এই জন্য লোকে
আমার নিন্দা করিত । পূজারি বামণের জ্বালায়
বাগানে ফুল ফুটিতে পায় না—আর নিন্দকের
জ্বালায় প্রসন্নের কাছে আমার মুখ ফুটিতে পায়
না—নচেৎ গব্যরসে ও কাব্যরসে বিলক্ষণ বিনি-
ময় চলিত । ইহাতে আমার নিজের জন্য আমি
যত দুঃখিত হই, না হই, প্রসন্নের জন্য আমি
একটু দুঃখিত । কেন না প্রসন্ন সতী, সাধবী,
পতিব্রতা । এ কথাও আমি মুখ ফুটিয়া বলিতে
পাই না । বলিয়াছিলাম বলিয়া, পাড়ার একটি

নষ্টবুদ্ধি ছেলে ইহার বিপরীত অর্থ করিয়াছিল । সে বলিল যে, প্রসন্ন আছেন, এজন্য সৎ বা সতী বটে, তিনি সাধুঘোষের স্ত্রী, এজন্য সাধ্বী ; এবং বিধবাবস্থাতেও পতিছাড়া নহেন, এজন্য ঘোর-তর পতিব্রতা । বলা বাহুল্য যে, যে অশিষ্ট বালক এই ঘৃণিত অর্থ মুখে আনিয়াছিল, তাহার শিক্ষার্থ, তাহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়া-ছিলাম, কিন্তু তাহাতে আমার কলঙ্ক গেল না ।

যখন লিখিতে বসিয়াছি, তখন স্পষ্ট কথা বলা ভাল—আমি প্রসন্নের একটু অনুরাগী বটে । তাহার অনেক কারণ আছে—প্রথমতঃ প্রসন্ন যে দুঃখ দেয়, তাহা নির্জল, এবং দামে সস্তা ; দ্বিতীয়, সে কখন কখন ক্ষীর সর, নবনীত আমাকে বিনামূল্যে দিয়া যায় ; তৃতীয়, সে এক দিন আমাকে কহিয়াছিল, “দাদাঠাকুর, তোমার দপ্তরে ও কিসের কাগজ ?” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “শুন্বি ?” সে বলিল, “শুনিব ।” আমি তাহাকে কয়েকটি প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইলাম—সে বসিয়া শুনিল । এত গুণে কোন্ লিপিব্যবসায়ী ব্যক্তি বশীভূত না হয় ? প্রসন্নের গুণের কথা আর

অধিক কি বলিব—সে আমার অনুরোধে আফিম ধরিয়াছিল ।

এই সকল গুণে, আমার মন কখন কখন প্রসন্নের ঘরের জানেলার নীচে ঘুরিয়া বেড়াইত, ইহা আমি স্বীকার করি । কিন্তু কেবল তাহার ঘরের জানেলার নীচে নয়, তাহার গোহালঘরের আগড়ের পাশেও উকি মারিত । প্রসন্নের প্রতি আমার যেরূপ অনুরাগ, তাহার মঙ্গলা নামে গাইয়ের প্রতিও তদ্রূপ । এক জন ক্ষীর সর নবনীতের আকর, দ্বিতীয়, তাহার দান-কর্তা । গঙ্গা বিষ্ণুপদ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভগীরথ তাঁহাকে আনিয়াছেন ; মঙ্গলা আমার বিষ্ণুপদ ; প্রসন্ন আমার ভগীরথ ; আমি দুই জনকেই সমান ভালবাসি । প্রসন্ন এবং তাহার গাই, উভয়েই সুন্দরী ; উভয়েই সুলাঙ্গী, লাবণ্যময়ী, এবং ঘটোধরী । এক জন গব্যরস সৃজন করেন, আর এক জন হাস্যরস সৃজন করেন । আমি উভয়েরই নিকট বিনামূল্যে বিক্রীত ।

কিন্তু আজি কালি সন্ধান করিয়া দেখিলাম,

প্রসন্নের গবাক্ষতলে, অথবা তাহার গোহালঘরে আমার মন নাই। আমার মন কোথা গেল ?

কাঁদিতে কাঁদিতে পথে বাহির হইলাম। দেখিলাম এক যুবতী জলের কলসী কক্ষে লইয়া যাইতেছে। তাহার মুখের উপর গভীর-কৃষ্ণ দোদুল্যমান কুঞ্চিতালকরাজি, গভীর-কৃষ্ণ ক্রয়ুগ, এবং গভীর-কৃষ্ণ চঞ্চল নয়নতারা দেখিয়া, বোধ হইল যেন পদ্মবনে কতকগুলি ভ্রমর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—বসিতেছে না, উড়িয়া বেড়াইতেছে। তাহার গমনে, যেরূপ অঙ্গ দুলিতেছিল, বোধ হইল যেন লাবণ্যের নদীতে ছোট ছোট ঢেউ উঠিতেছে ; তাহার প্রতিপদক্ষেপে বোধ হইল যেন পাঁজরের হাড় ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহাকে দেখিয়া আমার বোধ হইল, নিঃসন্দেহ এই আমার মন চুরি করিয়াছে। আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। সে কিরিয়া দেখিয়া ঈষৎ রুপ্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “ও কিও ? সঙ্গে নিয়েছ কেন ?”

আমি বলিলাম, “তুমি আমার মন চুরি করিয়াছ।”

যুবতী কটু ক্তি করিয়া গালি দিল । বলিল,
“চুরি করি নাই । তোমার ভগিনী আমাকে
যাচাই করিতে দিয়াছিল । দর কষিয়া আমি
ফিরাইয়া দিয়াছি ।”

সেই অবধি শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, মনের
সন্ধানে আর রসিকতা করিতে প্রয়াস পাই না,
কিন্তু মনে মনে বুঝিয়াছি যে, এ সংসারে আমার
মন কোথাও নাই । রহস্য ছাড়িয়া সত্য কথা
বলিতেছি, কিছুতে আমার আর মন নাই ।
শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতায় মন নাই, যে রহস্য-
লাপের আমি প্রিয় ছিলাম, সে রহস্যলাপে
আমার মন নাই । আমার কতকগুলি ছেঁড়া
পুথি ছিল—তাহাতে আমার মন থাকিত, তা-
হাতে আমার মন নাই । অর্থসংগ্রহে কখন
ছিল না—এখনও নাই । কিছুতে আমার মন
নাই—আমার মন কোথা গেল ?

বুঝিয়াছি, লঘুচেতাদিগের মনের বন্ধন চাই ;
নহিলে মন উড়িয়া যায় । আমি কখন কিছুতে
মন বাঁধি নাই—এজন্য কিছুতেই মন নাই ।
এ সংসারে আমরা কি করিতে আসি, তাহা ঠিক

বলিতে পারি না—কিন্তু বোধ হয় কেবল মন
 বাঁধা দিতেই আসি। আমি চিরকাল আপনার
 রহিলাম—পরের হইলাম না, এই জন্যই পৃথি-
 বীতে আমার সুখ নাই। যাহারা স্বভাবতঃ
 নিতান্ত আত্মপ্রিয়, তাহারাও বিবাহ করিয়া,
 সংসারী হইয়া, স্ত্রী পুত্রের নিকট আত্মসমর্পণ
 করে, এজন্য তাহারা সুখী। নচেৎ তাহারা
 কিছুতেই সুখী হইত না। আমি অনেক
 অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি, পরের জন্য আত্ম-
 বিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন
 মূল নাই। ধন, যশঃ, ইন্দ্রিয়াদিলক্ক সুখ আছে
 বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে। এ সকল প্রথম
 বারে যে পরিমাণে সুখদায়ক হয়, দ্বিতীয় বারে
 সে পরিমাণে হয় না, তৃতীয় বারে আরও
 অল্প সুখদায়ক হয়, ক্রমে অভ্যাসে তাহাতে কিছুই
 সুখ থাকে না। সুখ থাকে না, কিন্তু দুইটি
 অসুখের কারণ জন্মে; প্রথম, অভ্যস্ত বস্তুর ভাবে
সুখ না হউক, অভাবে গুরুতর অসুখ হয়;
এবং অপরিতোষণীয়া আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধিতে যন্ত্রণা
হয়। অতএব পৃথিবীতে যে সকল বিষয় কাম্য

বস্তু বলিয়া চিরপরিচিত, তাহা সকলই অতৃপ্তিকর
 এবং দুঃখের মূল । সকল স্থানেই যশের অনু-
 গামিনী নিন্দা, ইন্দ্রিয়স্বখের অনুগামী রোগ ;
 ধনের সঙ্গে ক্ষতি ও মনস্তাপ ; কান্ত বপু জরা-
 গ্রস্ত বা ব্যাধিদুগ্ঠ হয় ; সুনামেও মিথ্যা কলঙ্ক
 রটে ; ধন, পত্নীজারেও ভোগ করে ; মান সত্ৰম,
 মেঘমালার ন্যায় শরতের পর আর থাকে না ।
 বিদ্যা, তৃপ্তিদায়িনী নহে, কেবল অন্ধকার হইতে
 গাঢ়তর অন্ধকারে লইয়া যায়, এ সংসারের তত্ত্ব
 জিজ্ঞাসা কখন নিবারণ করে না । স্বীয় উদ্দেশ্য
 সাধনে বিদ্যা কখন সক্ষম হয় না । কখন শুনি-
 যাছ কেহ বলিয়াছে, আমি ধনোপার্জন করিয়া
 সুখী হইয়াছি, বা যশস্বী হইয়া সুখী হইয়াছি ? যেই
 এই কয় ছত্র পড়িবে, সেই বেঙ্গ করিয়া স্মরণ করিয়া
 দেখুক, কখন এমন শুনিয়াছে কি না । আমি শপথ
 করিয়া বলিতে পারি, কেহ এমত কথা কখন শুনে
 নাই । ইহার অপেক্ষা ধন মানাদির অকার্য্য-
 কারিতার গুরুতর প্রমাণ আর কি পাওয়া যাইতে
 পারে ? বিশ্বয়ের বিষয় এই যে, এমন অকাট্য প্রমাণ
 থাকিতেও মনুষ্য মাত্রেই তাহার জন্য প্রাণপাত

করে । এ কেবল কুশিক্ষার গুণ । মাতৃস্তুন্যদুষ্কের সঙ্গে সঙ্গে ধন মানাদির সর্বসারবতায় বিশ্বাস শিশুর হৃদয়ে প্রবেশ করিতে থাকে—শিশু দেখে রাত্রিদিন, পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী গুরু ভৃত্য প্রতিবেশী শত্রু মিত্র সকলেই প্রাণপণে হা অর্থ, হা যশ, হা মান, হা সম্ভ্রম ! করিয়া বেড়াইতেছে । সুতরাং শিশু কথা ফুটিবার আগেই সেই পথে গমন করিতে শিখে । কবে মনুষ্য নিত্য সুখের একমাত্র মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে? যত বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, দার্শনিক, সংসার-তত্ত্ববিৎ, যে কেহ আশ্ফালন কর, সকলে মিলিয়া দেখ, পর-সুখবর্দ্ধন ভিন্ন মনুষ্যের অন্য সুখের মূল আছে কি না? নাই । আমি মরিয়া ছাই হইব, আমার নাম পর্যন্ত লুপ্ত হইবে, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, এক দিন মনুষ্যমাত্রের আমার এই কথা বুঝিবে যে, মনুষ্যের স্থায়ী সুখের অন্য মূল নাই !!! এখন যেমন লোকে, উন্মত্ত হইয়া ধন মান ভোগাদির প্রতি ধাবিত হয়, এক দিন মনুষ্যজাতি সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া পরের সুখের প্রতি ধাবমান হইবে । আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার এ আশা এক দিন

ফলিবে ! ফলিবে, কিন্তু কত দিনে ! হায়, কে বলিবে, কত দিনে !

কথাটি প্রাচীন। সার্ক দ্বিসহস্র বৎসর পূর্বে, শাক্যসিংহ এই কথা কত প্রকারে বলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর, শত সহস্র লোকশিক্ষক শত সহস্র বার এই শিক্ষা শিখাইয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই লোকে শিখে না—কিছুতেই আত্মা-দরের ইন্দ্রজাল কাটাইয়া উঠিতে পারে না। আবার আমাদের দেশ ইংরেজি মুলুক হইয়া এ বিষয়ে বড় গণ্ডগোল বাঁধিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজি শাসন, ইংরেজি সভ্যতা ও ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে “মেট্রিরিয়েন্ প্রম্পেরিটির” উপর অনুরাগ আসিয়া দেশ উৎসন্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংরেজ জাতি বাহু সম্পদ বড় ভালবাসেন—ইংরেজি সভ্যতার এইটি প্রধান চিহ্ন—তাহারা আসিয়া এ দেশের বাহু সম্পদ সাধনেই নিযুক্ত—আমরা তাহাই ভাল-বাসিয়া আর সকল বিস্মৃত হইয়াছি। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেবমূর্তি সকল মন্দিরচ্যুত হইয়াছে—

সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত কেবল বাহু সম্পদের পূজা আরম্ভ হইয়াছে। দেখ, কত বাণিজ্য বাড়িতেছে—দেখ, কেমন রেইলওয়েতে হিন্দু-ভূমি জালনিবন্ধ হইয়া উঠিল—দেখিতেছ, টেলিগ্রাফ কেমন বস্তু! দেখিতেছি, কিন্তু কমলাকান্তের জিজ্ঞাসা এই যে, তোমার রেইলওয়ে টেলিগ্রাফে আমার কতটুকু মনের সুখ বাড়িবে? আমার এই হারাণ মন খুঁজিয়া আনিয়া দিতে পারিবে? কাহারও মনের আগুন নিবাহিতে পারিবে? ঐ যে কৃপণ ধনতৃষায় মরিতেছে, উহার তৃষা নিবারণ করিবে? অপমানিতের অপমান ফিরাইতে পারিবে? রূপোন্মত্তের ক্রোড়ে রূপসীকে তুলিয়া বসাইতে পারিবে? না পারে, তবে তোমার রেইলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি উপাড়িয়া জলে ফেলিয়া দাও—কমলাকান্ত শর্মা তাতে ক্ষতি বিবেচনা করিবেন না।

কি ইংরেজি কি বাঙ্গালা যে সম্বাদ-পত্র, সাময়িক পত্র, স্পীচ, ডিবেট; লেক্চর, যাহা কিছু পড়ি বা শুনি, তাহাতে এই বাহু সম্পদ ভিন্ন আর কোন বিষয়ের কোন কথা দেখিতে

পাই না। হর হর বম্ বম্ ! বাহু সম্পদের
 পূজা কর। হর হর বম্ বম্ ! টাকার রাশির
 উপর টাকা ঢাল ! টাকা ভক্তি, টাকা মুক্তি,
 টাকা নতি, টাকা গতি ! টাকা ধর্ম, টাকা অর্থ,
 টাকা কাম, টাকা মোক্ষ ! ও পথে যাইও না,
 দেশের টাকা কমিবে, ও পথে যাও, দেশের
 টাকা বাড়িবে ! বম্ বম্ হর হর ! টাকা বাড়াও,
 টাকা বাড়াও, রেইলওয়ে টেলিগ্রাফ অর্থ-
 প্রসূতি ও মন্দিরে প্রণাম কর ! যাতে টাকা
 বাড়ে এমন কর ! শূন্য হইতে টাকা বৃষ্টি হইতে
 থাকুক ! টাকার ঝন্ঝনিতে ভারতবর্ষ পুরিয়া
 যাউক ! মন ? মন, আবার কি ? টাকা ছাড়া
 মন কি ? টাকা ছাড়া আমাদের মন নাই ;
 টাকশালে আমাদের মন ভাঙ্গে গড়ে। টাকাই
 বাহু সম্পদ। হর হর বম্ বম্ ! বাহু সম্পদের
 পূজা কর। এ পূজার তাম্রশাশ্রুধারী ইংরেজ
 নামে ঋষিগণ পুরোহিত ; এডাম স্মিথ পুরাণ
 এবং মিল তন্ত্র হইতে এ পূজার মন্ত্র পড়িতে
 হয় ; এ উৎসবে ইংরেজি সম্বাদ-পত্র সকল ঢাক
 ঢোল, বাঙ্গালা সম্বাদ-পত্র কাশীদার ; শিক্ষা এবং

উংসাহ ইহাতে নৈবেদ্য, এবং হৃদয় ইহাতে
 ছাগবলি। এ পূজার ফল, ইহলোকে ও পর-
 লোকে অনন্ত নরক। তবে, আইস, সবে মিলিয়া
 বাহু সম্পদের পূজা করি। আইস, যশোগঙ্গার
 জলে ধৌত করিয়া, বঞ্চনা-বিল্বদলে মিষ্টকথা-
 চন্দন মাখাইয়া, এই মহাদেবের পূজা করি।
 বল, হর হর বম্ বম্ ! বাহু সম্পদের পূজা
 করি। বাজা ভাই ঢাক ঢোল,—ছ্যাড়্ ছ্যাড়্
 ছ্যাড়্, ছ্যাড়্ ছ্যাড়া ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ! বাজা ভাই
 কাঁশীদার,—ট্যাং ট্যাং ট্যাং নাট্যাং নাট্যাং !
 আসুন পুরোহিত মহাশয় ! মন্ত্র বলুন ! আমাদের
 এই বহুকালের পুরাতন ঘৃতটুকু লইয়া স্বধা স্বাহা
 বলিয়া আগুনে ঢালুন। কোথা ভাই ইউটিলিটে-
 রিয়েন্ কামার ! পাঁটা হাড়িকাটে ফেলিয়াছি; এক
 বার বাবা পঞ্চানন্দের* নাম করিয়া, এক কোপে
 পাচার কর ! হর হর বম্ বম্ ! কমলাকান্ত দাঁড়াইয়া
 আছে, মুড়িটি দিও ! তোমরা স্বচ্ছন্দে পূজা কর !

*পঞ্চানন নাম প্রসিদ্ধ নহে—পঞ্চানন্দই প্রসিদ্ধ। মদ্য,
 মাংস, গাড়িজুড়ি, পোষাক, এবং বেশা—এই পাঁচটি
 আনন্দে এই নূতন পঞ্চানন্দ।

পূজা কর, ক্ষতি নাই, কিন্তু আমাকে গোটাকত কথা বুঝাইয়া দাও। তোমার বাহ্য সম্পদে কয় জন অভদ্র ভদ্র হইয়াছে? কয় জন অশিষ্ট শিষ্ট হইয়াছে? কয় জন অধার্মিক ধার্মিক হইয়াছে? কয় জন অপবিত্র পবিত্র হইয়াছে? এক জনও না? যদি না হইয়া থাকে, তবে তোমার এ ছাই আমরা চাই না—আমি হুকুম দিতেছি, এ ছাই ভারতবর্ষ হইতে উঠাইয়া দাও।

তোমাদের কথা আমি বুঝি। উদর নামে বৃহৎ গহ্বর, ইহা প্রত্যহ বুজান চাই; নহিলে নয়। তোমরা বল যে, এই গর্ত, যাহাতে সকলেরই ভাল করিয়া বুজে, আমরা সেই চেষ্টায় আছি। আমি বলি সে মঙ্গলের কথা বটে, কিন্তু উহার অত বাড়াবাড়িতে কাজ নাই। গর্ত বুজাইতে তোমরা এমনই ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছ যে, আর সকল কথা ভুলিয়া গেলে। বরং গর্তের এক কোণ খালি থাকে, সেও ভাল, তবু আর আর দিকে একটু মন দেওয়া উচিত। গর্ত বুজান হইতে মনের সুখ একটা স্বতন্ত্র সামগ্রী;

তাহার বুদ্ধির কি কোন উপায় হইতে পারে না? তোমরা এত কল করিতেছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয় বুদ্ধির জন্য কি একটা কিছু কল হয় না? একটু বুদ্ধি খাটাইয়া দেখ, নহিলে সকল বেকল হইয়া যাইবে।

আমি কেবল চিরকাল গর্ত্ত বুজাইয়া আসিয়াছি—কখন পরের জন্য ভাবি নাই। এই জন্য সকল হারাইয়া বসিয়াছি—সংসারে আমার সুখ নাই; পৃথিবীতে আমার থাকিবার আর প্রয়োজন দেখি না। পরের বোঝা কেন ঘাড়ে করিব, এই ভাবিয়া সংসারী হই নাই। তাহার ফল এই যে, কিছুতেই আমার মন নাই। আমি সুখী নহি। কেন হইব? আমি পরের জন্য দায়ী হই নাই, সুখে আমার অধিকার কি?

সুখে আমার অধিকার নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না যে, তোমরা বিবাহ করিয়াছ বলিয়া সুখী হইয়াছ। যদি পারিবারিক স্নেহের গুণে তোমাদের আত্মপ্রিয়তা লুপ্ত না হইয়া থাকে, যদি বিবাহ নিবন্ধন তোমাদের চিত্ত মার্জিত না হইয়া থাকে, যদি আত্মপরিবারকে

ভালবাসিয়া তাবৎ মনুষ্যজাতিকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাক, তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ ; কেবল ভূতের বোঝা বহিতেছ । ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বা পুত্রমুখ নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে । যদি বিবাহবন্ধে মনুষ্য-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই । ইন্দ্রিয়াদি অভ্যাসের বশ ; অভ্যাসে এ সকল একেবারে শান্ত থাকিতে পারে । বরং মনুষ্যজাতি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া পৃথিবী হইতে লুপ্ত হউক, তথাপি যে বিবাহে প্রীতি শিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই ।

এক্ষণে কমলাকান্ত যুক্তকরে সকলের নিকট নিবেদন করিতেছে, তোমরা কেহ কমলাকান্তের একটি বিবাহ দিতে পার ?



ষষ্ঠ সংখ্যা ।

চন্দ্রালোকে ।

এই তৃণ-শম্পা-শোভিত হরিৎক্ষেত্রে, এই কলবাহিনী ভাগীরথী-তীরে, এই স্ফুটচ্চন্দ্রালোকে, আজি দপ্তরের শ্রীষ্মন্ধি, কলেবর-ষ্মন্ধি করিব । এইরূপ চন্দ্রালোকেই না, টেলস শর্মা ট্রয়ের উচ্চ প্রাচীরে আরোহণ করিয়া, ক্রিসীদাকে স্মরণ করিয়া উষ্ণ শ্বাস ত্যাগ করিতেন ! এইরূপ চন্দ্রালোকেই না থিসবী সুন্দরী এইরূপ মৃদু শিশির-পাত-সিক্ত শম্পা মৃদু পদে দলিত করিয়া পিরামসের সঙ্কেত স্থানাভিমুখে অভিসারিণী হইতেন ? অভিসারিণী শব্দটিতে অভি একটি উপসর্গ আছে, স্ম একটি ধাতু আছে এবং দ্বীত্যবাচক একটি 'ইনী' আছে ; এই জীবনে কমলাকান্ত শর্মা কত উপসর্গ দেখিলেন, কত লোকের ধাতু ছাড়িল গঠিল দেখিলেন, কত ইনীও এলেন গেলেন, কিন্তু

সোপসর্গ ধাতু বিশিষ্ট একটি ইনীও কখন দেখি-
লাম না। কমলাকান্ত উপসর্গে কোন ইনীর
ধাতু বিগড়াইল না। কমলাভিসারিণী, এরূপ
নায়িকা কখন হইল না। যাহারা দধি দুগ্ধ
বিক্রয়ার্থ আগমন করে, তাহাদিগকে শ্রীমদ্ভাগ-
বতে “পসারিণী” বলিয়াছে, কখন অভিসারিণী
বলিয়াছে, এরূপ স্মরণ হয় না, তাহা যদি বলিত,
তাহা হইলে অনেক অভিসারিণী দেখিয়াছি
বলিতে পারিতাম।

চন্দ্র তুমি হাস্য করিতেছ? হেসে হেসে
ভেসে উঠিতেছ? তোমরা সাতাইশ ইনী শুদ্ধ
আমাকে দেখিয়া, আমার প্রতি চক্ষু টিপিয়া
উপহাস করিতেছ? দক্ষ রাজার যেমন কর্ম—
একেবারে সাতাইশটিকে এক চন্দ্রে সমর্পণ
করিলেন, আর এখন কমলাকান্ত শর্মা বিবাহের
জন্য লালায়িত! অমল-ধবল কিরণরাশি
সুধাংশো! আর সকল তোমার থাক, তুমি
অন্ততঃ অশ্লেষা মঘাকে ছাড়িয়া দেও, আমি ওই
দুইটিকে বড় ভালবাসি। আমার মত নিষ্কর্মা
লোক উহাদের কল্যাণে অন্ততঃ দুই দিন গৃহবাস-

সুখ উপলব্ধি করিতে পারে। আমি ঐ ভগিনী-
দ্বয়কে আমার ভবনে চিরকাল জন্য স্থান দান
করিয়া, সুখে কাল কৰ্ত্তন করিব। ইহাদিগের
আরও অনেক গুণ আছে—লোকে নিজে অক্ষ-
মতা নিবন্ধন কোন কৰ্ম করিতে না পারিয়া
স্বচ্ছন্দে ইহাদিগের দোহাই দিয়া লোকের কাছে
আসফালন করিতে পারে। আমিও নশীবাবুর
কাপড় কিনিতে যদি নিবুদ্ধিতা বশতঃ প্রতারিত
হইয়া আসি, তবে আমার সহধর্মিণীদ্বয়ের স্কন্ধে
সমস্ত দোষ অর্পণ করিয়া সাফাই করিতে পারিব।

চন্দ্রদেব! তুমি আমার কথায় কৰ্ণপাত
করিলে না? এখনও মন্দাকিনীর মন্দান্দোলিত
বক্ষ-বসন করস্পর্শে প্রতিভাসিত করিতেছ?
এখনও মন্দ সমীরণের সহ পরামর্শ করিয়া বৃক্ষের
অগ্রভাগে পলকে পলকে ঝলক বর্ষণ করিবে?
এখনও তৃণ-ক্ষেত্রে মণি মুক্তা মরকত অকাতরে
ছড়াইয়া দিবে? উলুবনে মুক্তা, আর কেহ
ছড়াক আর না ছড়াক, দেখিতেছি তুমি ছড়া-
ইয়া থাক। আর আজ আমি ছড়াইব।

এই সংসারের লোক, এই বল্লালসেনের

প্র-পরা-অপ-পৌত্রেরা এবং তাঁহার নিরু-দুর্-বি-
 অধি-দৌহিত্রেরা আমাকে জ্বালাতন করিয়া তুলি-
 য়াছে । আমার বন্ধের উপরি বিশ্ববিদ্যালয়
 স্থাপিত হইয়াছে । বি, এ, না হলে বিয়ে হয়
 না । এই বার সংসার ডুবিল ! উচ্চ শিক্ষায় ফল
 কি ? ছাপর খাট—রূপার কলসী, গরদের কাচা,
 এবং স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিতা, পটু-বসনারতা, একটি
 বংশখণ্ডিকা ! হরি হরি বল, ভাই ! ভূগ্রাহী
 পাণ্ডিত্যভিমানী বি, এ, উপাধিধারী উচ্চশিক্ষা-
 প্রাপ্ত নব বঙ্গবাসীর, কলসী বস্ত্র বংশ খটাসমেত
 সজ্জানে গঙ্গালাভ হইল !!!* প্রথমে উপাধি
 পাইয়াছিলেন, এ বার সমাধি পাইলেন । তিনি
 বিলাতী ব্রহ্মে লীন হইলেন । বঙ্গীয় যুবক
 সংসারী হইলেন । তাঁহার উচ্চশিক্ষা তাঁহাকে
 তাঁহার চরমধামে পৌঁছিয়া দিয়াছে । তিনি
 সহস্র তোলক পরিমিত রজতপাত্র, শত তোলক
 পরিমিত স্বর্ণালঙ্কার এবং সংসার-কুটীরের এক
 মাত্র দণ্ডিকা, একটি বংশ-খণ্ডিকা পাইয়াছেন,

* বোধ হয় এই রাত্রি হইতেই কমলাকান্তের বাতি-
 কের বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছিল ।—শ্রীভীষ্মদেব খোসনবীশ ।

তিনি তাঁহার চিরবাসিত হেমকূট পর্বত নিকটস্থ কিক্কিন্ধ্যাপুরীর সরকারি ওকালতী পাইয়াছেন, হরি হরি বল, ভাই ! তাঁহার এত দিনে সমাধি হইল !!! তিনি উচ্চশিক্ষা লাভার্থ বহু যত্নে কামস্কাটকা দেশের নদী সঁকলের নাম কঠাণ্ডে করিয়াছিলেন। এই উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি নিশীথ-প্রদীপে অনন্যমনে শাহারা মরুভূমির বালুকাপুঞ্জের সংখ্যা ধারণ করিয়াছিলেন। এই-উচ্চশিক্ষার জন্যই শার্লিমানের উর্দে বায়ান্ন পুরুষ নিম্নে নাড়ে তিপ্পান্ন পুরুষের কুলচি মুখস্থ করিয়াছেন। এই উচ্চশিক্ষা-বলে তিনি শিখিয়া ছেন যে, টাউনহলে বক্তৃতা করিতে পারিলেই পরম পুরুষার্থ ; ইংরেজের নিন্দা যে কোন প্রকারে করিতে পারিলেই রাজনীতির একশেষ হইল। এবং বংশ-দণ্ডিকার স্থাপন করিয়া উমেদার গোষ্ঠীর বৃদ্ধি করিয়া দেশ জঙ্গলময় করিতে পারিলেই কলির জীবধর্মের চরিতার্থতা হইত।

এরূপ বংশ-দণ্ডিকা-প্রয়াসী আমি নহি। আমি উইল করিয়া যাইব, সাত পুরুষ বিবাহ করিতে না হয় তাও কর্তব্য, তথাপি এরূপ বংশদণ্ডিকা

আশ্রয়ে স্বর্গ-প্রাপ্তির বাঞ্ছাও কেহ না করে ।
 যদি জীবপ্রবাহ বন্ধি করাই বিবাহের উদ্দেশ্য
 হয়, তবে আমি মংস্রাদি বিবাহ করিব ; যদি
 টাকার জন্য বিবাহ করিতে হয়, তবে আমি টাঁক-
 শালের অধ্যক্ষকে বিবাহ করিব ; আর যদি
 সৌন্দর্য্যার্থে বিবাহ করিতে হয়, তবে—ঘোম্টা-
 টানা চাঁদবদনীদের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া,
 ঐ আকাশের চাঁদকে বিবাহ করিব ।

ভাগীরথি ! যদি তুমি শান্তনুবক্ষে অথবা
 তদপেক্ষা উচ্চতর হিমালয়-ভবনে, অথবা আরো
 উচ্চতর ধূর্জটীর জটা-কলাপে বিরাজ করিতে,
 তাহা হইলে কে আজ তোমার উপাসনা
 করিত ? তুমি নীচগা হইয়া, মর্ত্যে অবतरণ
 করিয়া সহস্রধা হইয়া সাগরোদ্দেশে গমন
 করিয়াছিলে বলিয়াই সগর-বংশের উদ্ধার হই-
 যাচ্ছে ; সমীরণ ! তুমি যদি অঞ্জনার অঞ্চল লইয়া
 চিরক্রীড়াসক্ত থাকিতে, অথবা মলয়াচলে স্নায়
 প্রমোদভবনে চন্দন-শাখা নমিত করিয়া বা এলা
 লতা কম্পিত করিয়া পরিভ্রমণ করিতে, তাহা
 হইলে কে তোমাকে “তুমিই জগজ্জীবনং পালনং”

বলিয়া আর তোমার স্তব স্তুতি করিত ? এই বাল-বসন্ত-বিহারী বিহঙ্গমকুলের কাকলি যদি কেবল নন্দন-কাননেই প্রতিধ্বনিত হইত, তাহা হইলে কমলাকান্ত চক্রবর্তী তাহাদের নাম করিয়া এই রাত্রিকালে স্বীয় মসী লেখনীর অনর্থক ক্ষয় করিবে কেন ? সুধাংশো ! তুমি তোমার ক্ষীরোদ-সাগর-তলে, অমৃত-ভাণ্ডারে, প্রবাল-পালঙ্কে মৌক্তিক-শয্যায় শয়িত থাকিতে, তাহা হইলে কে তোমার সহিত রমণী-মুখ-মণ্ডলের তুলনা করিত ? অথবা তোমার ঐ সাতাইশটি ক্রমান্বয় ভর্তৃকা লইয়া খলু সার শ্বশুর-মন্দির দক্ষালয়ে বাস করিতে, তাহা হইলে আজি কমল শর্ম্মা কি তোমার দর্শনাভিলাষী হইয়া—এই শ্মশান নিকট বটতলায় তীরস্থ হইয়া বাস করে ?

শশী—যদি তোমার ব্যাকরণ পড়া থাকে, তবে আমাকে মাপ করিও, আমি প্রাণান্তেও শশিন্ বলিতে পারিব না—আমি এত ক্ষণ তোমার গুণের অনুধ্যান করিতেছিলাম ; শশী, তুমি অনাথার কুটীরদ্বারে প্রহরী রূপে অনিমেঘ-নয়নে বসিয়া থাক, আধভাষী শিশু যখন নাচিতে

নাচিতে তোমায় ধরিতে যায়, তুমি তাহার সঙ্গে
 নাচিতে নাচিতে খেলা কর, বালিকা যখন স্বচ্ছ
 সরোবর-হৃদয়ে তোমায় এক বার দেখিতে পাইয়া,
 এক বার না পাইয়া, তোমার সন্দর্শন লাভার্থ,
 ইতস্ততঃ সরোবরকূলে দৌড়িতে থাকে, তখন
 তুমি এক এক বার ঈষৎ দেখা দিয়া তাহার
 সহিত কেবল লুকোচুরি খেলিতে থাক, নববধু
 যখন মন্দ বাত সহিত প্রাসাদোপরি একাকিনী
 দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে থাকে, তখন তুমি নারিকেল
 কুঞ্জান্তরাল হইতে অতি ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়
 ভরিয়া অমৃত বর্ষণ করিয়া তাহাকে ক্রমে শীতল
 কর ; যখন তরঙ্গিণী আশা-তরঙ্গিত-হৃদয়ে ধীর
 প্রবাহে মন্দগতিতে সিন্ধু-অভিগামিনী হয়, তখন
 তুমিই তাহাকে স্বর্ণ-ভূষণে ভূষিত করিয়া আশী-
 র্বাদ করিয়া পথ প্রদর্শন করিয়া থাক ; গোলাপ
 যখন বসন্ত-রাগে এক বৃত্তে চারি দিক দেখিয়া
 হেলিতে ঢুলিতে থাকে, তখন তুমিই তাহাকে
 মালতী লতাকে চুম্বন করিতে কানে কানে পরা-
 মর্শ দেও । আবার সেই তুমিই, অসদভিসন্ধিৎসু
 নর যখন কুলকামিনীর ধর্ম্মনাশে প্রবৃত্ত হয়, তখন

তোমার কোমল মুখমণ্ডলে এমনি ক্রকুটি করিতে
 থাক যে, সে তোমার মুখ পানে আর দৃষ্টিক্ষেপ
 করিতে সমর্থ হয় না ; তুমিই নরহত্যাকারীর
 তরবারিফলকে বিদ্যুৎ চমকাইয়া দেও, তাহার
 পাপ শোণিত-বিন্দুতে চৌষটি রৌরব প্রতি-
 ফলিত করিয়া দেখাইয়া দেও ।

তুমি ক্রীড়াশীল শিশুর চলৎ স্বর্ণস্থালী,
 তরুণের আশা-প্রদীপ ; যুবক যুবতীর যামিনী-
 যাপনের প্রধান সম্ভোগ-পদার্থ ; এবং স্হবিরের
 স্মৃতি-দর্পণ । তুমি অনাথার প্রহরী, স্থির দীপ-
 ধারী ; তুমি পথিকের পথ-প্রদর্শক ; গৃহীর নৈশ-
 সূর্য্য ; তুমি পাপীর পাপের সাক্ষী ; পুণ্যাত্মার
 চক্ষে তাহার যশঃপতাকা । তুমি গগনের উজ্জ্বল
 মণি ; জগতের শোভা । আর এই শ্মশানবিহারী
 শ্রীকমলাকান্তের একমাত্র সম্বল ; তুমি ভালর
 ভাল, মন্দের মন্দ ; রসে রস, বিরসে বিষ । তুমি
 কমলাকান্তের সহধর্ম্মিণী ; শশী, আমি তোমায়
 বড় ভালবাসি, আমি তোমাকেই বিবাহ করিব ।
 সকলে হরি হরি বল, ভাই ! আজ এইখানে
 বাসর যাপন—সকলে এক বার হরি বল, ভাই !

বয় ভোলানাথ ! চন্দ্র যে পুরুষ ? তবে ডবল
মাত্রা চড়াইতে হইল ।

চন্দ্র আমাদিগের আৰ্য্য মতে পুরুষ বটে,
কিন্তু বিলাতীয় শর্মাদিগের মতে ইনি কোম-
লাঙ্গী । আমাদিগের মতে চন্দ্র হি,* ইংরাজি
মতে চন্দ্র শী, এখন উপায় ? হি কি শী তাহা
স্থির হইবে কি প্রকারে ?

বাস্তবিক এই বিষয়ে সংসারের লোকের সঙ্গে
আমার কখন মতের ঐক্য হইল না । আমার এ
বিষয়ে নানা সন্দেহ হয় । যে ওয়াজিদালিশাহা
লক্ষ্মী নগরী হইতে স্বচ্ছন্দে চতুর্দোলারোহণে
মুচিখোলায় আগমন করিয়া, হংস হংসী
কপোত কপোতী লইয়া ক্রীড়া করেন, গোলাপ
সহিত বারি-হুদে নিত্য স্নান করিয়া, স্বীয়ানুরূপী
পিঞ্জরস্থ বুলবুলিকে সম্বৃতপলান্ন প্রদান করেন,
তিনি হি না শী ? এবং যে মহিষী দেশ-বাং-
সল্যে ঐহিক সুখ সম্পত্তি বিসর্জন করিয়া—
রাজপুরুষগণের শরণাপন্ন হওয়াপেক্ষা ভিক্ষার

* হি শী কাহাকে বলে ? শুনিয়াছি দুইটি ইংরাজি
সর্কনাম—হি পুংলিঙ্গ—শী স্ত্রীলিঙ্গ—শ্রীভীষ্মদেব ।

শ্রেয়ঃ বোধে, নেপালের পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছেন, তিনি শী না হি ? তবে ত সাহসকে হি-শীর প্রভেদক করা যায় না । তবে যুদ্ধ-নৈপুণ্যে হি-শীর প্রভেদ হইবে ? যে জোয়ান ওলিয়ান্স দুর্গ 'আক্রমণকালে সর্ব-প্রথমে পদার্পণ করিয়াছিল, যে ফ্রান্সের পুন-রুদ্ধার করিয়াছিল, তাহাকে শী বলিব না হি বলিব ? আর যে বেড্‌ফোর্ড—তাহাকে পাকচক্রে ফেলিবার জন্য সেই জোয়ানের কারাগারে পুরুষের বস্ত্র সংরক্ষণ করিয়াছিল, তাহাকেই বা হি বলিব না শী বলিব ? না যুদ্ধ-কৌশলে বুদ্ধিতে পারিলাম না । তবে শুনা যায় যে বলীয়ান, সেই পুরুষ আর যে জাতি দুর্বল, তাহারাই স্ত্রীলোক । ভাল—কোমৎ আপনাকে নীতিরাজ্যের সর্ব-সর্বা স্থির করিয়া, ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট কর যাচঞা করিয়াছিলেন, সেই অতুল প্রতাপশালীকে যে মাদম ক্লোতিলড দেবো স্বীয় প্রতাপের আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহাকে শী বলিব না হি বলিব ? রোমক পতনের কৈসরগণ এক এক জন পৃথিবীর রাজা, যে মৈনরী রাজ্ঞী

ক্লিপেটরা একরূপ তিন জন কৈসরের উপর রাজত্ব করিয়াছেন ; তাঁহাকে শী বলিব, না হি বলিব ? বাস্তবিক জগতে কে হি, কে শী, তাহা স্থির করা যায় না। সে দিন কীর্তন হইতেছিল, যখন কীর্তন-গায়িকা বলিল—“সিংহিনী হইয়া শিবা-পদ সেবিব ?” এবং বঙ্গ নব্য-সম্প্রদায়েরা মন্ত্র-সুত্রবৎ, চিত্রপুতলিকার ন্যায় তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, আমার বাস্তবিক সেই কীর্তন গায়িকাকে সিংহবৎ বোধ হইয়াছিল এবং সেই সমস্ত বাঙ্গালি যুবককেই আমি শিবা স্বরূপ মনে করিয়াছিলাম। তখন যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিত, এর কোন্‌গুলি হি, কোন্‌গুলিই বা শী ; তাহা হইলে, আমি অবশ্য বলিতাম যে, সেই কীর্তনকারিণীই হি এবং তাঁহার জড়বৎ শ্রোতৃবর্গই শী। বাস্তবিক বঙ্গীয় যুবকেরা কোথাও হি, কোথাও শী, এবং সর্বত্র বিকল্পে ইট্ হন। তাহার নিত্য বিধিও আছে। যথা—ইয়ারকিতে হি, শয্যাগৃহে শী, এবং বিষয় কর্মে ইট্। তাঁহারা বক্তৃতা সময়ে হন হি, সাহেবের কাছে শী, মদ খাইলে হন ইট্। ফলে

ইট্ যাহাই হউক, হি, শীর বিষয়ে আমার আপনা আপনি অনেক সন্দেহ হয় । মধু চাটুয্যে আমার নাম সংযোগ করিয়া কি বিদ্রুপ করিয়াছিল বলিয়া, যে প্রসন্ন, স্বচ্ছন্দে পূর্ণদুঃখ-কুন্ত তাহার মস্তকে নিষ্ক্রেপ করিয়া, চাটুয্যের বক্ষ-কবাটের বল পরীক্ষা করণার্থ কোনরূপ বিশেষ আয়ুধ প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, সে প্রসন্ন সংসারের মতে হইল শী—আর আমি—নশী বাবু কি না এক দিন বলিয়াছিলেন—“যে চক্রবর্তী ঝিমুতে ঝিমুতে আজ বিছানাটা পোড়ালে, এক দিন একটা লঙ্কাকাণ্ড করিবে দেখ্‌ছি”—সেই ভয়ে আকিঙ্গের মাত্রা কমাইয়া দিলাম, সেই আমি হইলাম হি ? এইরূপ বিচারের জন্যই সংসারের সঙ্গে আমার বিবাদ, বিসম্বাদ । ফল কথা, যখন আমি নিজে হি কি শী, তাহা নিশ্চয় করা দুষ্কর, তখন চন্দ্র হি কিন্মা শী তাহার স্থিরতা কি প্রকারে হইবে ? যদি চন্দ্র হি হইলেন, ত আমি শী—কেন না আমার সহিত চন্দ্রের ভালবাসা জন্মিয়াছে । এবং আমার চন্দ্রকে বিবাহ করিতেই হইবে । আর আমি যদি প্রকৃত এক জন কমলাকান্ত চক্রবর্তী

হই, তাহা হইলে চন্দ্র শী । চন্দ্র বিলাতীয় মতে
শী । আমি তাহা হইলে চন্দ্রকে বিলাতীয় মতে
পাণিগ্রহণ করিব ।

এখন নানা মতে নানা কার্য্য হইতেছে ; আমি
বিলাতীয় মতে বিবাহ করিব । এখন দশাবতার
দশকর্মান্বিত হইয়াছেন । মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ
টেবিলের শোভা সম্বন্ধন করিতেছেন । নৃসিংহ-
রাম কমলাকান্ত রূপ দৈত্যকুলের প্রহ্লাদগণের
আশ্রয়ভূত হইয়াছেন । বামনাবতারে বঙ্গীয়
যুবকগণ, আমার সোণারচাঁদ শশীকে স্পর্শ
করিতে স্পর্কী করে । প্রথম রামের স্থানে ইঁহারা
মাতৃ-সেবা, দ্বিতীয় রামের স্থানে পত্নী-সেবা, এবং
শেষ রামের নিকটে বারুণী-সেবা শিক্ষা করিয়া-
ছেন । ইঁহারা বৌদ্ধ-মতে সংসারের অনিত্যতা
স্থির করিয়া, কঙ্কিমতে সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া-
ছেন । এখনকার কালে শাক্তমতে ভোজ্য প্রস্তুত
হইয়া, তাহা শৈব ত্রিশূলে বিদ্ধ করিয়া গলাধঃ-
করণ করিতে হয় ; তাহার পর সৌর পান সেব-
নীয় । আবার জিরুশালমের প্রথম গৌরাঙ্গের
উপদেশ মত ভজনশালা করিতে হয় । মেজো

গৌরাঙ্গ নবদ্বীপবাসীর মত হরিসংকীৰ্ত্তন করিতে হয়, রাধানগরের ছোট গৌরাঙ্গের মত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিতে হয় ।

সুতরাং শশী, পূর্ণশশী, আজি আমি তোমাকে ইংরাজি মতে, শী স্থির করিয়া, হোস্ বাহালে সুস্থ শরীরে, খোস্ তবিয়েতে ইচ্ছাপূৰ্ব্বক বিবাহ করিলাম । আমি পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে পরম সুখে অনেকের বিনা সরিকতে তোমাতে ভোগ দখল করিতে থাকিব । ইহাতে তুমি কিম্বা তোমার স্থলাভিষিক্ত কেহ কখন কোন আপত্তি কর বা করে, তাহা নামঞ্জুর হইবে । তোমার সাতাইশটিতে আজ হইতে আমার 'সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার হইল ।

আর অমন করিয়া, পা টিপিয়া, পা টিপিয়া, চলে পড়িয়া রোহিণীর সঙ্গে কথা कहিলে কি হইবে ? আর অমন করে মুচ্কে হেসে পাতলা মেঘের ঘোমটা টেনে, তর্ তর্ করিয়া কত দূর চলিয়া যাইবে ? ইতি কোর্টশিপ্ সমাপ্ত :—

এক্ষণে গান্ধর্ষ বিবাহ । আমি বরমাল্য প্রদান করিলাম, তুমি করমাল্য প্রদান কর ।

কন্যাকর্তা হৈল কন্যা, বরকর্তা বর ।

নিজ মন পুরোহিত, শ্মশানে বাসর ॥

এক বার হরি বল, ভাই ! হরি হরি বোল ।

আজ অবধি আর চন্দ্রকে দেখিয়া কমল
মুদিত হইবে না । • কমল ফুল হইতে দেখিলে
আর চন্দ্র ম্লান হইবে না । এই বার ভারতবর্ষীয়
কবিগণের কবিত্ব লোপ হইল—পূর্বে

কমল মুদিত অঁাখি চন্দ্রে হেরিলে,

এখন

চন্দ্রে দেখিতে দেখ কমল অঁাখি মিলে ।

চন্দ্রের হৃদয়ে কালি কলঙ্ক কেবল,

কিন্তু

কমল-হৃদয়ে চন্দ্র কেবল উজ্জ্বল ।

আহা ! আমি আমার চন্দ্রকে হারাইয়া
দিয়াছি । বর বড় না, ক'নে বড়, এই দেখ বর
বড়—

চন্দ্রে সবে ষোল কলা হাস বৃদ্ধি তায়,

চক্রবর্তী পরিপূর্ণ এক কাঁদি কলায় ।

সেই কলা কভু লুপ্ত কভু বর্তমান ।

কমলের বাগানের সব মর্তমান ! ।

দেখ শশী এখন নির্জ্জন হইল । তোমাকে গোটাকত কথা বলিতে ইচ্ছা করি ।

তুমি তোমার রূপ-গৌরবে গর্বিতা হইয়া যেখানে সেখানে ও রূপের ছড়াছড়ি করিও না । যখন পুত্র-শোকাতুরা মাতা-বক্ষে করাঘাত করিয়া তোমার দিকে লক্ষ্য করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে, তখন তুমি তাহার কাছে রূপ দেখাইয়া কি করিবে ? তখন কলঙ্কিনি ! তোমার রূপরাশি গাঢ় মেঘান্তুরালে লুক্কায়িত করিয়া রাখিও । যখন সংসার-জ্বালাজ্বালে লোকে দগ্ধ হইয়া, তোমার দরবারে আসিয়া অভিযোগ করিবে, তখন তোমার সৌন্দর্য-বিকাশ তাহার কাছে করিও না ; যে সংসারদগ্ধ, তাহার পক্ষে সে সৌন্দর্য তীব্র বিষ-ক্ষেপ রূপ হইবে । বরং রক্ত রাগে তাহার সহিত আলাপ করিও । যে সকলকে ঘৃণা করিয়াছে, কাহারও প্রীতি সে সহ্য করিতে পারে না ।

আর যে ঐহিক চরম সুখের সীমা উপলব্ধি করিয়া আত্মবিসর্জনে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাকে আর বৃথা আশা দিয়া সান্ত্বনা করিও না । তুমি

এক্ষণে আমার এক-ভোগ্যা, তুমি আর কি দেখা-
 ইয়া অপরকে সান্ত্বনা করিবে? কিন্তু কমলা-
 কান্তের সময় অসময় নাই। ঘটন বিঘটন
 নাই, সুখ দুঃখ নাই। তুমি সর্বদাই আমার
 নিকট আসিবে; তোমার নিজকথা আমাকে
 বলিবে, আমার কথা শুনিয়া যাইয়া, আপনার
 অন্তরে আপনার অস্থি-মজ্জার সহিত সেই কথা
 মিশাইয়া, রাখিয়া দিবে। তুমি জ্যেৎস্না রাত্রিতে
 আমার সহিত দেখা করিতে আসিও, ও কোমল
 কান্তি লইয়া অন্ধকারে বিচরণ করিও না। অদ্য
 আমাদের যে সুখের দিন, তাহা তুমি আমি
 ব্যতীত কে বুঝিতে পারিবে? অদ্য হইতে মাস
 গণনা করিয়া প্রতি মাসের শেষে আমরা এই
 গঙ্গাতীরে শম্পা-বাসর সমাপন করিব। সকল
 পূর্ণ মাসেই তুমি হঠাৎ আমার কাছে আগমন
 করিও না; পঞ্জিকাকারগণের সহিত দিন ক্ষণের
 পরামর্শ করিয়া কমলাভিসারিণী হইও, নচেৎ
 এক দিন রাহু তোমাকে পথিমধ্যে হঠাৎ মসীময়ী
 করিয়া ক্লিষ্ট করিবে। আর এই বিবাহ-রাত্রিতে
 নব বধূকে অধিক উপদেশ প্রদান করিতে গেলে

ধর্ম-যাজকতার ভান হয় । সুতরাং অলমতি-
বিস্তরেণ ।

এখন এক বার,

কমল শশীর বাসর ঘরে,

ডাক রে কোকিল পঞ্চমস্বরে !

এখন শশী একবার, এই মর্ত্য লোকে
অবতীর্ণ হইয়া তরঙ্গের উপর অপ্সরা-ছাঁদে
নৃত্য কর দেখি ! এক বার কাল মেঘের
ভিতর বেগে দৌড়াইয়া গিয়া, এক বার
অনন্ত গগনের অনন্ত পথে উন্টাইয়া পড় দেখি !
এক বার গভীর মেঘে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া রক্ত-পথে
এক চক্ষু দিয়া আমার দিকে মধুর দৃষ্টিপাত কর
দেখি ! এক বার নক্ষত্রে নক্ষত্রে কলহ বাধাইয়া
দিয়া, তাহারা যেমন পরস্পর সংগ্রাম করিতে
আসিবে, অমনি তাহাদের উভয় দলের ব্যুহ
বিদীর্ণ করিয়া বেগে ধাবিত হও দেখি ! এক বার
ক্রত সঞ্চালনে শ্রান্তি বোধ করিয়া মুক্তাবিনিদিত
শ্বেদবিন্দুসিক্ত কপালে ঘোমটা তুলিয়া দিয়া
গগন-গবাক্ষে স্থির দৃষ্টিতে বসিয়া বায়ু সেবন কর
দেখি ! এক বার অজস্র সুধাবর্ষণ করিয়া চকোর-

চক্রে অপরিতৃপ্ত রমনার তৃপ্তিসাধন কর দেখি ;
এক বার শুভক্ষণে কমলাকান্তের হৃদয়ে আবিভূত
হও, কমলাকান্ত শয়ন করিল ।

শশী, তুমি ক্ষীরোদ-সাগরজা, ত্রিভুবন-বিহা-
রিণী হইয়াও বালিকা-স্বভাব-সুলভ অভিমানের
ভজনা করিলে ? কমলাকান্ত কোন্ দোষে দোষী
বলিতে পারি না—কখন এক বার স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ-
জটিলতা-জাল-চ্ছেদনার্থ উদাহরণচ্ছলে প্রসন্নর
নাম করিয়াছিলাম বলিয়া, এত অভিমান আজি-
কার রজনীতে ভাল দেখায় না। দেখ, তুমি
কলঙ্কিনী, তবু আমি তোমাকে গ্রহণ করিলাম ।
তোমাকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়া অদ্যাবধি
Lunatic* নাম ধরিলাম । জ্যোতির্বিদেরা বলিয়া
থাকেন, তুমি পাষণী—তবু আমি তোমাকে বিবাহ
করিলাম । তাঁহারা বলেন, তোমাতে মনুষ্যত্ব
নাই, তবু আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম । তবু
রাগ ?—তবে এই সংসার-গরল-খণ্ডন, এই
গিরি-তরু-শিরসি-মণ্ডন, ঐ কর লেখা আমার
মাথায় তুলিয়া দাও । পার যদি, ঐ অনন্তনীল

* চন্দ্রগ্রস্ত, চাঁদে পাওয়া বা পাগল ।

বুন্দাবনে, মেঘের ঘোমটা টানিয়া, এক বার রাই
মানিনী হইয়া বসে। ! আমি এক বার জ্বীলোকের
পায়ে ধরিয়া এ জড়জীবন সার্থক করিয়া লই।*
আজি আমি শত দোষে দোষী হইলেও তোমা
হইতেই আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।
তুমি আমার চান্দ্রায়ণের চন্দ্র-ফলক ! আমার
বৈতরণীর নবীন বৎস।

অমন করিলে আমি শত সহস্র বিবাহ করিব।
এখন কমলাকান্ত নূতন বিবাহের রীতি পদ্ধতি
শিক্ষা করিয়াছে। কমল এখন স্বয়ং বর, কর্তা,
পুরোহিত, ঘটক হইতে শিখিয়াছে। কমল
এখন যেখানে সেখানে বিবাহ করিতে পারে।
যখন দেখিব, নব পল্লবিকা শাখা-স্কন্ধ হইতে মুখ
বাড়াইয়া করপত্র সঞ্চালনে আহ্বান করিতেছে,
তখনই আমি তাহাকে বিবাহ করিব। যখন দেখিব,
পদ্মমুখী স্বচ্ছ সরসী-দর্পণে আপনার মুখ বঙ্কিম
গ্রীবায় নিরীক্ষণ করিয়া হাসিতেছে, তখনই আমি
স্থলকমলে, জলকমলে মিশাইয়া দিব। যখন

* আমি জানি কমলাকান্ত একদিন প্রসন্ন গোয়ালার
পায়ে ধরিয়াছেন। কিন্তু সে ছুঁচের জন্ত।—শ্রীভীষ্মদেব।

দেখিব,নিরু'রিণী রামধনুক ধরিয়া আনিয়া তাহাই
লোফালুফি করিয়া খেলা করিতেছে, তখনই
তাহাকে সেই ধনুঃ স্পর্শ করাইয়া শপথ দিয়া
আমার সঙ্গিনী করিয়া লইব। যখন দেখিব,
অনন্ত শয্যায় স্বর্ণদী ঝণিভুষায় খেতাম্বরে ভূষিত
হইয়া উত্তর দক্ষিণ শয়নে নিদ্রা যাইতেছে, তখ-
নই তাহাকে পাণিগ্রহণে ধীরে ধীরে জাগরিত
করিয়া অর্দ্ধাঙ্গের ভাগিনী করিব। যখন দেখিব,
কুঞ্জলতা কানে ঝুমুকা দোলাইয়া শ্যাম চিকুর-
রাণি চারি দিকে ছড়াইয়া নিস্তরুভাবে যুঁছু সৌর
কিরণে ঈষত্তপ্ত হইতেছে, তখনই তাহার কেশ-
গুচ্ছ মধ্যে মস্তক সন্নিবেশিত করিয়া তাহার
ঝুমুকা সরাইয়া দিয়া তাহার বরকে চিনাইয়া
দিব। কমলাকান্ত চক্রবর্তী এখন বিবাহ করিতে
শিখিল, ঘটকালী শিখিল, আর কাহারও উপা-
সনা করিবে না। যদি তোমরা আমার পরামর্শে
শ্রদ্ধা কর, ত আমার মত বিবাহ কর—আমি বেশ
ঘটকালী জানি, তোমাদের মনের মত সামগ্রী
মিলাইয়া দিব।

বসন্তের কোকিল ।

তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক । যখন ফুল ফুটে, দক্ষিণ বাতাস বহে, এ সংসার স্রুথের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর । আর যখন দারুণ শীতে জীবলোকে থরহরি কম্প লাগে, তখন কোথায় থাক, বাপু ? যখন শ্রাবণের ধারায় আমার চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক চিল ভিজিয়া গোময় হয়, তখন তোমার মাজা মাজা কালো কালো দুলালি ধরণের শরীরখানি কোথায় থাকে ? তুমি বসন্তের কোকিল, শীত বর্ষার কেহ নও ।

রাগ করিও না—তোমার মত আমাদের মাঝখানে অনেকে আছেন । যখন নশী বাবুর তালুকের খাজানা আসে, তখন মানুষ-কোকিলে তাঁহার গৃহকুঞ্জ পুরিয়া যায়—কত টিকি, ফেঁটা,

তেড়ি, চসমার হাট লাগিয়া যায়,—কত কবিতা,
শ্লোক, গীত, হেটো ইংরেজি, মেটো ইংরেজি,
চোরা ইংরেজি, ছেঁড়া ইংরেজি, (যশুরে ইংরে-
জিতে) নশী বাবুর বৈঠকখানা পারাষত-কাকলি-
সংকুল গৃহসৌধবৎ বিকৃত হইয়া উঠে । যখন
তাঁহার বাড়ীতে নাচ, গান, যাত্রা, পর্ক উপ-
স্থিত হয়, তখন দলে দলে মানুষ কোকিল
আসিয়া, তাঁহার ঘর বাড়ী আঁধার করিয়া তুলে
—কেহ খায়, কেহ গায়, কেহ হাসে, কেহ
কাশে, কেহ তামাক পোড়ায়, কেহ হাসিয়া
বেড়ায়, কেহ মাত্রা চড়ায়, কেহ টেবিলের নীচে
গড়ায় । যখন নশী বাবু বাগানে যান, তখন মানুষ
কোকিল, তাঁহার সঙ্গে পিপীড়ার সারি দেয় ।
আর যে রাত্রে, অবিশ্রান্ত যুষ্টি হইতেছিল,
আর নশী বাবুর পুত্রটির অকালে মৃত্যু হইল,
তখন তিনি একটি লোক পাইলেন না । কাহা-
রও “অসুখ,” এজন্য আসিতে পারিলেন না ;
কাহারও বড় সুখ—একটি নাতি হইয়াছে, এজন্য
আসিতে পারিলেন না ; কাহারও সমস্ত রাত্রি
নিদ্রা হয় নাই, এজন্য আসিতে পারিলেন না ;

কেহ সমস্ত রাত্রি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, এজন্য আসিতে পারিলেন না। আসল কথা, সে দিন বর্ষা, বসন্ত নহে, বসন্তের কোকিল সেদিন আসিবে কেন?

তা ভাই, বসন্তের কোকিল, তোমার দোষ নাই, তুমি ডাক। ঐ অশোকের ডালে বসিয়া রান্ধা ফুলের রাশির মধ্যে কাল শরীর, জ্বলন্ত আগুনের মধ্যগত কালো বেগুনের মত, লুকাইয়া রাখিয়া, এক বার তোমার ঐ পঞ্চম স্বরে, কু—উ বলিয়া ডাক। তোমার ঐ কু—উ রবটি আমি বড় ভালবাসি। তুমি নিজে কালো—পরান্ন-প্রতিপালিত, তোমার চক্ষে সকলই “কু”—তবে যত পার, ঐ পঞ্চম স্বরে ডাকিয়া বল, “কু—উ।” যখন এ পৃথিবীতলে এমন কিছু সুন্দর সামগ্রী দেখিবে যে, তাহাতে তোমার ঘেঁষ, হিংসা, ঈর্ষ্যার উদয় হয়, তখনই উচ্চ ডালে বসিয়া ডাকিয়া বলিও, “কু—উ”—কেন না তুমি সৌন্দর্য্য-শূন্য, পরান্নপ্রতিপালিত। যখনই দেখিবে, লতা সন্ধ্যার বাতাস পাইয়া, উপযুঁপরি বিন্যস্ত পুষ্প-স্তবক লইয়া দুলিয়া উঠিল, অমনি স্নগন্ধের তরঙ্গ ছুটিল—তখনই ডাকিয়া বলিও

“কু—উঃ ।” যখনই দেখিবে, অসংখ্য গন্ধরাজ
 এক কালে ফুটিয়া আপনাদিগের গন্ধে আপনারা
 বিভোর হইয়া, এ উহার গায়ে চলিয়া পড়িতেছে,
 তখনই তোমার সেই ডাল হইতে ডাকিয়া
 বলিও, “কু—উঃ ।” যখন দেখিবে, বকুলের
 অতি ঘনবিন্যস্ত মধুরশ্যামল স্নিকোজ্জ্বল পত্র-
 রাশির শোভা আর গাছে ধরে না—পূর্ণযৌবনা
 সুন্দরীর লাবণ্যের ন্যায় হাসিয়া হাসিয়া, ভাসিয়া
 ভাসিয়া, হেলিয়া তুলিয়া, ভাসিয়া গলিয়া, উছ-
 লিয়া উঠিতেছে, তাহার অসংখ্য প্রস্ফুট কুমু-
 মের গন্ধে আকাশ যাতিয়া উঠিতেছে—তখন
 তাহারই আশ্রয়ে বসিয়া সেই পাতার স্পর্শে অঙ্গ
 শীতল করিয়া, সেই গন্ধে দেহ পবিত্র করিয়া, সেই
 বকুলকুঞ্জ হইতে ডাকিও, এ “কু—উঃ ।” যখন
 দেখিবে, শুভ্র-মুখী, শুদ্ধশরীরী, সুন্দরী নবমল্লিকা
 সন্ধ্যা-শিশিরে সিক্ত হইয়া, আলোক-প্রার্থ্যের
 হাস দেখিয়া, ধীরে ধীরে মুখখানি খুলিতে
 সাহস করিতেছে—স্তরে স্তরে অসংখ্য অকলঙ্ক
 দল-রাজি বিকসিত করিবার উপক্রম করিতেছে,
 —যখন দেখিবে যে, ভ্রমর সে রূপ দেখিয়া—

“আদরেতে আশুসারি”—কণ্ঠভরা গুন্‌গুন্‌ মধু
ঢালিয়া দিতেছে—তখন, হে কালামুখ! আবার
“কু—উঃ” বলিয়া ডাকিয়া মনের জ্বালা নিবাইও।
আর যখনই গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গনস্থ দাড়িম্বশাখায়
বসিয়া, দেখিবে সেই গৃহপুষ্পরূপিণী কন্যাগণে
সেই লতার দোলনি, সেই গন্ধরাজের প্রস্ফুটতা,
সেই বকুলের রূপোচ্ছ্বাস, সেই মল্লিকার অম-
লতা একাধারে মিলিত করিয়াছে, তখনই তাহা-
দের মুখের উপর, ঐ পঞ্চম-স্বরে, গৃহপ্রাচীর
প্রতিধ্বনিত করিয়া, সবাইকে ডাকিয়া বলিও, এত
রূপ, এত সুখ, এত পবিত্রতা—এ “কু—উঃ!” এটি
তোমার জিত—ঐ পঞ্চম-স্বর! নহিলে তোমার ও
কু—উ কেহ গুণিত না। এ পৃথিবীতে গ্লাডষ্টোন
ডিস্বেলি প্রভৃতির ন্যায়,—তুমি কেবল গলা-
বাজিতে জিতিয়া গেলে—নহিলে অত কালো
চলিত না; তোমার চেয়ে হাঁড়িটাঁচা ভাল। গলা-
বাজির এত গুণ না থাকিলে, যিনি বাজে নবেল লিখি-
য়াছেন, তিনি রাজমন্ত্রী হইবেন কেন? আর জন
ষ্ট্রুয়ার্ট মিল পার্লামেন্টে স্থান পাইলেন না কেন?
তবে, কোকিল, তুমি প্রকৃতির মহা-পালি-

মেটে দাঁড়াইয়া নক্ষত্রময় নীলচন্দ্রাতপমণ্ডিত,
 গিরিনদী নগর কুঞ্জাদি বেঞ্চে সুসজ্জিত, ঐ মহা-
 সভা-গৃহে,তোমার এ মধুর পঞ্চম-স্বরে—কু—উঃ
 বলিয়া ডাক—সিংহাসন হইতে হৃষ্টিংস্ পর্যন্ত
 সকলেই কাঁপিয়া উঠুক। “কু—উঃ।” ভাল,
 তাই; ও কলকণ্ঠে কু বলিলে কু মানিব, সু
 বলিলে সু মানিব। কু বৈ কি? সব কু। লতার
 কণ্টক আছে; কুম্বে কীট আছে; গন্ধে বিষ
 আছে; পত্র শুষ্ক হয়, রূপ বিকৃত হয়, স্ত্রীজাতি
 বর্ণনা জানে। কু—উঃ বটে—তুমি গাও। কিন্তু
 তুমি ঐ পঞ্চম-স্বরে কু বলিলেই কু মানিব—
 নচেৎ কঁকড়ো বাবাজি “কু কু কু কু” বলিয়া
 আমার সুখের প্রভাত নিদ্রাকে কু বলিলে আমি
 মানিব না। তার গলা নাই। গলাবাজিতে
 সংসার শাসিত হয় বটে, কিন্তু কেবল চেঁচাইলে
 হয় না; যদি শব্দ-মন্ত্রে সংসার জয় করিবে, তবে
 যেন তোমার স্বরে পঞ্চম লাগে—বে-পরদা বা
 কড়িমধ্যমের কাজ নয়। সর্ জেমস্ মাকিণ্টশ্,
 তাঁহার বক্তৃতায় ফিলজফির* কড়িমধ্যম মিশা-

ইয়া হারিয়া গেলেন—আর মেকলে রেটরিকের*
 পঞ্চম লাগাইয়া জিতিয়া গেলেন । ভারতচন্দ্র
 আদিরস পঞ্চমে ধরিয়া জিতিয়া গিয়াছেন—কবি-
 কঙ্কণের ঋষভ-স্বর কে শুনে ? দেখ লোকের
 বৃদ্ধ পিতা মাতার বেসুরো বকুবকিতে কোন ফল
 দর্শে ? আর যখন বাবুর গৃহিণী বাবুর সুর
 বাঁধিয়া দিবার জন্য বাবুর কান টিপিয়া ধরিয়া
 পঞ্চমে গলার আওয়াজ দেন, তখন বাবু পিড়িং
 পিড়িং বলেন, কি না ?

তবে তোমার স্বরকে পঞ্চম-স্বর কেন বলে, তাহা
 বুঝি না । যাহা মিষ্ট, তাহাই পঞ্চম ? দুইটি পঞ্চম
 মিষ্ট বটে,—সুরের পঞ্চম, আর আন্তাপরা ছোট
 পায়ের গুজুরী পঞ্চম । তবে, সুর, পঞ্চমে উঠিলেই
 মিষ্ট ; পায়ের পঞ্চম, পা হইতে নামাইলেই মিষ্ট ।

কোন স্বর পঞ্চম, কোন স্বর লপ্তম, কে মধ্যম,
 কে গান্ধার আমাকে কে বুঝাইয়া দিবে ? এটি
 হাতীর ডাক, ওটি ঘোড়ার ডাক, সেটি ময়ূরের
 কেকা, ওটি বানরের কিচিমিচি, এ বলিলে ত কিছু
 বুঝিতে পারি না । আমি আফিংখোর—বেসুরো

শুনি, বেসুরো বুঝি, বেসুরো লিখি—ধৈবত
 গান্ধার নিষাদ পঞ্চমের কি ধার ধারি ? যদি কেহ
 পাখোয়াজ তানপুরা দাড়া দাঁত লইয়া, আমাকে
 সপ্ত সুর বুঝাইতে আসে, তবে তাহার গর্জন
 শুনিয়া, মঙ্গলা গাইয়ের সদ্যঃপ্রসূত বৎসের ধ্বনি
 আমার মনে পড়ে—তাহার পীতাবশিষ্ট নির্জ্বল
 দুষ্কের অনুধ্যানে মন ব্যস্ত হয়—সুর বুঝা হয় না।
 আমি গায়কের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে
 কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ করি, যেন তিনি
 জন্মান্তরে মঙ্গলার বৎস হন।

এখন আয়, পাখী ! তোতে আমাতে এক
 বার পঞ্চম গাই। তুইও যে, আমিও সে—সমান
 দুঃখের দুঃখী, সমান সুখের সুখী। তুই এই
 পুষ্পকাননে, বৃক্ষে বৃক্ষে আপনার আনন্দে গাইয়া
 বেড়াস্—আমিও এই সংসার-কাননে, গৃহে
 গৃহে, আপনার আনন্দে এই দপ্তর লিখিয়া বে-
 ডাই—আয়, ভাই, তোতে আমাতে মিলে মিশে
 পঞ্চম গাই। তোরও কেহ নাই—আনন্দ আছে,
 আমারও কেহ নাই—আনন্দ আছে। তোর পুঁজি-
 পাটা ঐ গলা ; আমার পুঁজিপাটা, এই আফি-

সের ডেলা ; তুই এ সংসারে পঞ্চম-স্বর ভাল-
বাসিস্—আমিও তাই ; তুই পঞ্চম-স্বরে কারে
ডাকিস্ ? আমিই বা কারে ? বল্ দেখি, পাখী,
কারে ?

যে সুন্দর, তাকেই ডাকি ; যে ভাল, তাকেই
ডাকি ; যে আমার ডাক শুনে, তাকেই ডাকি ।
এই যে আশ্চর্য্য ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া কিছুই বুঝিতে
না পারিয়া বিস্মিত হইয়া আছি, ইহাকেই
ডাকি । এই অনন্ত সুন্দর জগৎ-শরীরে যিনি
আত্মা, (তবে) তাঁহাকে ডাকি । আমিও ডাকি,
তুইও ডাকিস্ । জানিয়া ডাকি না জানিয়া
ডাকি, সমান কথা ; তুইও কিছু জানিস্ না,
আমিও জানি না ; তোঁরও ডাক পৌঁছবে, আমা-
রও ডাক পৌঁছবে ! যদি সর্ব্বশব্দগ্রাহী কোন
কর্ণ থাকে, তবে তোঁর আমার ডাক পৌঁছবে না
কেন ? আয়, ভাই, এক বার মিলে মিশে দুই
জনে পঞ্চম-স্বরে ডাকি ।

তবে, কুছরবে সাধা গলায়, কোকিল এক বার
ডাক্ দেখি রে ! কণ্ঠ নাই বলিয়া, আমার মনের
কথা কখন বলিতে পাইলাম না । যদি তোঁর ও

ভুবন-ভুলান স্বর পাইতাম, ত বলিতাম । তুই
আমার সেই মনের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া এই
পুষ্পময় কুঞ্জবনে এক বার ডাক্ দেখি রে ! কি
কথাটি বলিব বলিব মনে করি, বলিতে জানি না,
সেই কথাটি তুই বল্ দেখি রে ! কমলাকান্তের
মনের কথা, এ জন্মে বলা হইল না—যদি কো-
কিলের কণ্ঠ পাই—অমানুষী ভাষা পাই, আর
নক্ষত্রদিগকে শ্রোতা পাই, তবে মনের কথা
বলি । ঐ নীলাম্বর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ঐ নক্ষত্র-
মণ্ডলীমধ্যে উড়িয়া, কখন কি কুহু বলিয়া
ডাকিতে পাইব না ? আমি না পাই, তুই কো-
কিল আমার হয়ে এক বার ডাক্ দেখি রে !

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী ।

স্ত্রীলোকের রূপ ।

অনেক ভামিনী রূপের গৌরবে পা মাটিতে
দেন না । ভাবেন, যে দিক্ দিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
চলিয়া যান, লাবণ্যের তরঙ্গে সে দিকের সংজ্ঞা
ডুবিয়া যায় ; নূতন জগতের সৃষ্টি হয় । তাঁহারা
মনে করেন, তাঁহাদের রূপের ঝড় যে দিকে বয়,
সে দিকে সকলের ধৈর্য্য-চালা উড়িয়া যায়, ধর্ম্ম-
কোটা ভাঙ্গিয়া পড়ে ; যখন পুরুষের মন-চড়ায়
তাঁহাদের রূপের বান ডাকে, তখন তাঁহাদের
কর্ম্ম-জাহাজ, ধর্ম্ম-পান্সী, বুদ্ধি-ডিম্বি, সব ভাসিয়া
যায় । কেবল সৌন্দর্য্যভিমানিনী কামিনী-
কুলেরই এইরূপ প্রতীতি নহে ; পুরুষেরাও
যখন মহিলাগণের মোহিনী শক্তির বশীভূত
হইয়া তাহাদিগের রূপের মহিমা বর্ণনারম্ভ
করেন, তখন যে তাঁহারাও কি বলেন, ভাবিলে
বিস্মিত হইতে হয় । তখন গগনের জ্যোতিষ্ক,

পৃথিবীর পর্বত, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, লতা
 গুল্মাদি সকলকেই লইয়া উপমার জন্য টানা-
 টানি পাড়ান্—আবার, অনেককেই অপমানিত
 করিয়া ফিরিয়া পাঠান । রূপসীর মুখমণ্ডলের
 সহিত তুলনা করিয়া তাঁহারা পূর্ণশশীকে নিমন্ত্রণ
 করিয়া, আবার মসীবৎ স্নান বলিয়া ফেরত পাঠান ;
 গরিব চাঁদ, আপনার কলঙ্ক আপনি বুকে করিয়া
 রাতারাতি আকাশের কাজ সারিয়া পলায়ন
 করে । সুন্দরীর ললাটের সিন্দূরবিন্দু দেখিয়া
 তাঁহারা উষার সীমন্তু-শোভা তরুণ তপনের
 নিন্দা করেন ; রাগে সূর্য্যদেব, পৃথিবী দগ্ধ করিয়া
 চলিয়া যান । রসময়ীর আস্যের হাস্যরাশি অব-
 লোকন করিয়া প্রফুল্ল কমলে সৌর-রশ্মির লাস্য
 রা বিকসিত কুমুদে কোমুদীর নৃত্য তাঁহারা আর
 ভালবাসেন না ; সেই অবধি কমল কুমুদে কীট
 পতঙ্গের অধিকার । কামিনীর কণ্ঠহার নিরীক্ষণ
 করিয়া তাঁহারা নিশার তারকামালার প্রতি অবজ্ঞা
 প্রকাশ করেন ; বোধ করি, ভবিষ্যতে জ্যোতিষের
 অনুশীলন ত্যাগ করিয়া, স্বর্গকারের বিদ্যায় মন
 দিবেন । রঙ্গিণীর শরীর সকালনে তাঁহারা এত

লাবণ্যলীলা বিলোকন করেন যে, জ্যোৎস্নাময়ী
রজনীতে মন্দ মন্দ আন্দোলিত বৃক্ষপত্রে বা নিয়ত
কম্পিত সিন্ধু-হিল্লোলে চন্দ্রিকার খেলায় তাঁহা-
দিগের আর মন উঠে না। এই জন্যই বা, রাত্রে
নিদ্রা যান, এবং নদীকে ফলসী কলসী করিয়া
শুষ্টিতে থাকেন। আবার যখন রমণীর নয়ন
বর্ণন করেন, তখন সরোবরের মলয়-মারুতে
দোতুল্যমান নীলোৎপল দূরে থাকুক, বিশ্ব-
মণ্ডলের কিছুই তাঁহাদিগের ভাল লাগে না।

এই নারীমূর্তির স্তাবককুলের উপমানুভব-
শক্তির কিছু প্রশংসা করিতে হয়। এক চক্ষু,
তাঁহাদিগের কল্পনাপ্রভাবে কখন পক্ষী, যথা
খঞ্জন, চকোর ; কখন মৎস্য, যথা সফরী ; কখন
উদ্ভিদ, যথা পদ্ম, পদ্মপলাশ, ইন্দীবর ; কখন
জড় পদার্থ, যথা আকাশের তারা। এক চন্দ্র,
কখনও রমণীর মুখমণ্ডল, কখনও তাহার পায়ের
নখর।* উচ্চ কৈলাস-শিখর, এবং ক্ষুদ্র কোমল

* আমার বিবেচনায় চন্দ্রের সহিত নখরের তুলনা অতি
সুন্দর—কেন না উত্তম পদবিন্যাস হইতে পারে—যথা নখর-
মিকর হিমকর-করস্থিত কোকিল-কুজিত কুঞ্জকুটীরে।—এটি
আমার নিজের রচনা।—শ্রীভীষ্মদেব।

কোরক, একেরই উপমাশ্লল ; কিন্তু ইহাতেও
 কুলায় না বলিয়া দাড়িম্ব, কদম্ব, করিবুস্ত এই
 বিষয় উপমাশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছে । জলচর ক্ষুদ্র
 পক্ষী হংস, এবং স্থলচর প্রকাণ্ড চতুষ্পদ হস্তী,
 ইহাদিগের গমনে রৈষম্য থাকাই স্বাভাবিক উপ-
 লব্ধি ; কিন্তু কবিদিগের চক্ষে উভয়েই রমণী-কুল-
 চরণ-বিন্যাসের অনুকারী । আবার যে সে হাতীর
 গমনের সহিত, এই হংসগামিনীদিগের গমন-
 সাদৃশ্য নির্দেশ করা বিধেয় নহে ; যে হাতী
 হাতীর রাজা, সেই হাতীর সঙ্গেই গজেন্দ্র-
 গামিনীগণের গতি তুলনীয় । শুনিয়াছি হাতী,
 এক দিনে অনেক দূর যাইতে পারে ; অশ্বাদি
 কোন পশু তত পারে না । যাঁহাদিগকে দূরে
 যাইতে হয়, তাঁহারা এই গজেন্দ্রগামিনীদিগের
 পিঠে চড়িয়া যান না কেন ? যে দিকে রেইলওয়ে
 হয় নাই, সে দিকে বাছিয়া বাছিয়া গজগামিনী
 মেয়ের ডাক বসাইলে কেমন হয় ?

আমিও এক কালে কামিনী-ভক্ত কবিদল-
 ভূক্ত ছিলাম । আমি তখন এই অখিল সংসারে
 রমণীর ন্যায় সুন্দর বস্তু আর দেখিতে পাইতাম

না । চম্পক, কমল, কুন্দ, বন্ধুজীব, শিরীশ, কদম্ব, গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পচয় তখন কামিনী-কান্তি-প্রথিত কুসুম-মালিকার ন্যায় মনোহর বোধ হইত না । বলিতে কি, বসন্তের কুসুমবতী বসুমতী অপেক্ষাও আমি কুসুমময়ী মহিলাকে ভালবাসিতাম ; বর্ষার উচ্ছ্বসিত-সলিলা চিররঙ্গিনী তরঙ্গিনী অপেক্ষাও রসবতী যুবতীর পক্ষপাতী ছিলাম । কিন্তু এক্ষণে আর আমার সে ভাব নাই । আমার দিব্যজ্ঞান হইয়াছে । আমি মায়াময়ী মানবীমণ্ডলের কুহক-জাল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া পলায়ন করিয়াছি । জালিয়ার পচা জালে রাখব বোয়াল পড়িলে, যেমন জাল ছিঁড়িয়া পলায়ন করে, আমি তেমনি পলায়ন করিয়াছি ; ক্ষুদ্র মাকড়সার জালে যেমন গুব্বরে পোকা পড়িলে জাল ছিঁড়িয়া পলায়ন করে, আমি তেমনি পলায়ন করিয়াছি ; দুরন্ত গোরু, এক বার দড়ি ছিঁড়িতে পারিলে যেমন উর্দ্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করে, আমি তেমনি দৌড় মারিয়া পলায়ন করিয়াছি । সকলই আফিমের প্রসাদে ! হে মাতঃ আফিম দেবি ! তোমার কোঁটা অক্ষয়

হোক । তুমি বৎসর বৎসর সোণার জাহাজে
চড়িয়া চীন দেশে পূজা খাইতে যাও ! জাপান,
সাইবিরিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, সকলই
তোমার অধিকারভুক্ত হোক ; তোমার নামে
দেশে দেশে দুর্গোৎসব হউক । কমলাকান্তকে
পায়ে রাখিও । আমি তোমার কৃপায় সাধারণের
উপকারার্থে নিজের মন খুলিয়া দুই চারিটি কথা
বলিব ।

কথা শুনিয়া কেবল স্ত্রীলোকে কেন, অনেক
পুরুষেও আমাকে পাগল বলিবেন । বলুন । ক্ষতি
নাই । নূতন কথা যে বলে, সেই পাগল বলিয়া
গণ্য হয় । গালিলিও* বলিলেন, পৃথিবী ঘুরি-
তেছে । ইতালীয় ভদ্র সমাজ, ধার্মিক সমাজ,
বিদ্বান্ সমাজ, শুনিয়া হাসিলেন ; শুনিয়া স্থির
করিলেন, গালিলিওর মতিভ্রম হইয়াছে । কালের
শ্রোত বহিয়া গেল । ইতালীর ভদ্র সমাজ,
ধার্মিক সমাজ, বিদ্বান্ সমাজ, আর পৃথিবী ঘুরি-
তেছে শুনিলে হাসেন না ; গালিলিওকে আর
মতিভ্রান্ত জ্ঞান করেন না ।

* কোপনিকস্ P. D.

সকলে সৌন্দর্য্য বিষয়ে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য স্বীকার করেন । বিদ্যা, বুদ্ধি, বলে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার পাঠিয়াও, রূপের ঢীকা স্ত্রীলোকের মস্তকে দেন । আমার বিবেচনায় এটি মস্ত ভুল । আমি দিব্যচক্ষে দেখিয়াছি যে, পুরুষের রূপ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের রূপ অনেক দূর নিকৃষ্ট । হে মানময়ী মোহিনীগণ ! কুটিল কটাক্ষে কাল-কূট বর্ষণ করিয়া আমাকে এই দোষে দগ্ধ করিও না ; কালসর্পী-বিনিন্দিত বেণীদ্বারা আমাকে বন্ধন করিও না, ক্র-ধনুতে কোপে তীক্ষ্ণ শর যোজনা করিয়া আমাকে বিদ্ধ করিও না । বলিতে কি, তোমাদের নিন্দা করিতে ভয় করে । পথ বুঝিয়া যদি তোমরা নত-ফাঁদ পাতিয়া রাখ, তবে কত হস্তী বদ্ধচরণ হইয়া, তোমাদের নাকে ঝুলিতে পারে—কমলাকান্ত কোন্ ছার ! তোমাদের নথের নোলক খসিয়া পড়িলে, মানুষ খুন হইবার অনেক সম্ভাবনা ; চন্দ্রহারের একখানি চাঁদ যদি স্থানচ্যুত হইয়া কাহারও গায়ে লাগে, তবে তাহার হাত পা ভাঙ্গা বিচিত্র নহে । অতএব তোমরা রাগ করিও না । আর হে রমণীপ্রিয়,

কল্পনাপ্রিয়, উপমাপ্রিয় কবিগণ, তোমাদিগের
 স্ত্রীদেবীর সুখময়ী সুবর্ণময়ী প্রতিমা ভাঙ্গিতে
 প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া, তোমরা আমাকে মারিতে
 উদ্যত হইও না। আমি সপ্রমাণ করিয়া দিব
 যে, তোমরা কুসংস্কারবিষ্ট পৌত্তলিক। তোমরা
 উপাস্য দেবতার প্রকৃত মূর্তি পরিত্যাগ পূর্বক
 বিকৃত প্রতিমূর্তির পূজা করিতেছ।

যাহার সুন্দর কেশপাশ আছে, সে আর পর-
 চুলা ব্যবহার করে না। যাহার উজ্জ্বল ভাল
 দাঁত আছে, তাহার কৃত্রিম দন্তের প্রয়োজন হয়
 না। যাহার বর্ণে লোকের মন হরণ করে, তাহার
 আর রং মাখিয়া লাভণ্য বৃদ্ধি করিতে হয় না।
 যাহার নয়ন আছে, তাহার আর কাচের চক্ষুর
 আশ্রয় লইতে হয় না। যাহার চরণ আছে,
 তাহাকে আর কাষ্ঠপদ অবলম্বন করিতে হয় না।
 এইরূপ যাহার যে বস্তু আছে, সে তাহার জন্য
 লালায়িত হয় না। যে বুদ্ধিতে পারে যে, প্রকৃতি
 কোন পদার্থে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, সেই
 তদ্বিষয়ে আপনার অভাব মোচনার্থে যত্ন করিয়া
 থাকে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি স্থির

করিয়াছি যে, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সৌন্দর্যের অত্যন্ত অভাব । তাহারা সর্বদা আপন আপন রূপ বাড়াইতে ব্যস্ত ; কি উপায়ে আপনাকে সুন্দরী দেখাইবে, ইহা লইয়াই উন্মাদিনী ; ভাল ভাল অলঙ্কার কিসে পাইবে, নিয়ত ইহাই তাহাদিগের ভাবনা, ইহাই তাহাদিগের চেষ্টা ; এমন কি, বলা যাইতে পারে যে, অলঙ্কারই তাহাদিগের জপ, অলঙ্কারই তাহাদিগের তপ, অলঙ্কারই তাহাদিগের ধ্যান, অলঙ্কারই তাহাদিগের জ্ঞান । স্বীয় দেহ সজ্জিত করিতে এত তাহাদিগের যত্ন, তাহাদিগের প্রকৃত সৌন্দর্য্য যে অধিক আছে, এরূপ বোধ হয় না । যাহার নাক সুন্দর নহে, সেই নাকে নথরূপ রজ্জুতে নোলক-জগন্নাথকে দোলায় ; যাহার কান সুন্দর নহে, সেই ঢাকাই-কানরূপ নানা ফলফুল পশুপক্ষী-বিশিষ্ট বাগানের যোড়া কানে ঝুলাইয়া দেয় । যাহার হৃদয় ভাল নহে, সেই মেখানে সাতনর ফাঁসির দড়ি টাঙ্গাইয়া পুরুষজাতির, বিশেষতঃ স্তন্যপায়ী বালকদিগের ভীতি বিধান করে । যে অলঙ্কার বিনাও আপনাকে সুন্দরী বলিয়া জানে.

সে কখন অলঙ্কারের বোঝা বহিতে এত ব্যগ্র হয় না। পুরুষে ভূষণ বিনা সম্ভব থাকে ; স্ত্রীলোকে ভূষণ বিনা মনুষ্যসমাজে মুখ দেখাইতে লজ্জা পায়। অতএব স্ত্রীলোকদিগের নিজের ব্যবহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীজাতি সৌন্দর্য্য বিষয়ে নিকৃষ্ট।

স্ত্রীজাতি অপেক্ষা যে পুরুষজাতির সৌন্দর্য্য অধিক, প্রকৃতির সৃষ্টি-পদ্ধতি সমালোচনা করিয়া দেখিলে আরও স্পষ্ট প্রতীতি হইবে। যে বিস্তীর্ণ চন্দ্রককলাপ দেখিয়া জলদমুকুট ইন্দ্রধনু হারি মানে, সে চন্দ্রককলাপ ময়ূরের আছে; ময়ূরীর নাই। যে কেশেরে সিংহের এত শোভা, তাহা সিংহীর নাই। (যে বিশাল দন্তে হস্তীর এত সৌন্দর্য্য, হস্তিনীর তাহা নাই।) যে ঝুটিতে বৃষভের কান্তি বৃদ্ধি করে, গাভীর তাহা নাই। কুকুটের যেমন সুন্দর তাম্র-চূড়া ও পক্ষ সকল আছে, কুকুটীর তেমন নাই। এইরূপ দেখিতে পাইবে যে, উচ্চ শ্রেণীর জীবদিগের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ সুশ্রী। মনুষ্য সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সৃষ্টিকর্তা যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন,

এমন বোধ হয় না। হে মূল “বিদ্যাসুন্দর”-কার ! তোমার মনে কি এই তত্ত্বটি উদিত হইয়াছিল ? এজন্যই কি তুমি নায়কের নাম সুন্দর রাখিয়াছিলে ? তুমি কি বুঝিয়াছিলে যে, স্ত্রীলোক যত কেন বিদ্যাবতী হউক না, পুরুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও বুদ্ধির নিকটে তাহাকে পরাভব স্বীকার করিতে হইবে।

সৌন্দর্যের বাহার যৌবনকালে। কিন্তু, রূপান্ধ-ভামিনীগণ ! তোমাদিগের যৌবন কতক্ষণ থাকে ? জোয়ারের জলের মত আসিতে আসিতেই যায়। কুড়ি হইলেই তোমরা বুড়ী হইলে। অল্প দিনের মধ্যেই তোমাদিগের অঙ্গ সকল শিথিল হইয়া পড়ে। বয়স আসিয়া শীঘ্রই তোমাদিগের গলার লাবণ্যমালা ছিঁড়িয়া লয়। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশে পুরুষের যে স্ত্রী থাকে, বিশ পঁচিশের উর্দ্ধে তোমাদিগের তাহা থাকে না। তোমাদিগের রূপের স্থিতি সৌদামিনীর ন্যায়, ইন্দ্রধনুর ন্যায়, মুহূর্তেক জন্য না হউক, অত্যল্প কালের জন্য সন্দেহ নাই। যাহারা রূপোপভোগে উন্মত্ত, আমি আহারে বসিলেই তাহাদের যন্ত্রণা অনুভূত

করিতে পারি ;—আমার জীবনে যোর দুঃখ এই যে, অল্প ব্যঞ্জন পাতে দিতে দিতেই ঠাণ্ডা হইয়া যায় । তেমনি, স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যরূপ বুকড়ি চালের ভাত, প্রণয়-কলাপাতে ঢালিতে ঢালিতে ঠাণ্ডা হইয়া যায়—আর কাহার সাধ্য খায় ? শেষে বেশভূষা রূপ তেঁতুল মাথিয়া, একটু আদর-লবণের ছিটা দিয়া, কোনরূপে গলাধঃকরণ করিতে হয় ।

হে সৌন্দর্য্যগর্ষিত কামিনীকুল ! সত্য করিয়া বল দেখি, এই রূপ ক্ষণস্থায়ী বলিয়াই কি তোমাদিগের রূপের এত আদর ? ভাল করিয়া দেখিতে, না দেখিতে, ভাল করিয়া উপ-ভোগ করিতে না করিতে, অন্তর্হিত হইয়া যায় বলিয়া, তোমাদিগের রূপের জন্য কি পুরুষেরা পিপাসিত চাতকের ন্যায় উন্মত্ত ? অপরিজ্ঞাত হারাধন বলিয়াই কি তোমরা উহার প্রকৃত মূল্য-নির্ণয়ে অশক্ত ? কেবল ক্ষণস্থায়ী পদার্থ বলিয়া নয়, অপর কারণেও স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য মনো-হর মূর্ত্তি ধারণ করে । যে সকল গ্রন্থকারদিগের মত ভ্রমণে গ্রাহ্য হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই

পুরুষ, এ কারণে আমার বিবেচনায় অনুরাগ-
নেত্রে কাশিনীকুলের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন।
কথাই আছে, “যার যাতে মজে মন, কিবা হাড়ি
কিবা ডোম।” যে রমণীগণ প্রণয়ের পদার্থ,
তাহাদিগকে কে সহজ চক্ষুতে দেখিবে? সুন্দর
মুকুরের প্রভাবে দৃষ্ট বস্তু কুৎসিত হইলেও সুন্দর
দেখাইবে। মনোমোহিনীর রূপ নিরীক্ষণকালে
তাহাকে প্রীতিরঞ্জে মাখাইয়া দেখিব। পুরুষা-
পেক্ষা তাহার মাধুর্য কেন না অধিক বোধ
হইবে?

হে প্রণয়দেব, পাশ্চাত্য কবিরা তোমাকে
অন্ধ বলিয়াছেন। কথাটা মিথ্যা নয়। তোমার
প্রভাবে লোকে প্রিয় বস্তুর দোষ দেখিতে পায়
না। তোমার অঞ্জে যাহার নেত্র রঞ্জিত হই-
য়াছে, সে বিশ্ববিমোহন পদার্থ-পরম্পরায় পরি-
বৃত্ত থাকে। বিকট মূর্তিকে সে মনোহর দেখে।
কর্কশ স্বরকে সে মধুময় ভাবে। প্রেতিনীর অঙ্গ-
ভঙ্গীকে মৃদু-মন্দ-মলয়-মারুতে দোদুল্যমানা ললিতা
লবঙ্গলতার লাবণ্যলীলা অপেক্ষাও সুখকরী জ্ঞান
করে। এজন্যই চীনদেশে খাঁদা নাকের আদর।

এজন্যই বিলাতী বিবিদের রাঙ্গা চুল ও ষিড়াল চোকের আদর। এজন্যই কাফি দেশে সুল ওষ্ঠাধরের আদর। এজন্যই বাঙ্গালদেশে উল্কি-চিত্রিত মিশি-কলঙ্কিত চাঁদবদনের আদর। এজন্যই মানবসমাজে স্ত্রীরূপের আদর। আর যদি স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় মনের কথা মুখে আনিতেন, তাহা হইলে, হে প্রণয়দেব, নিজের গুণে হউক না হউক, অন্ততঃ তোমার গুণেও আমরা গুণিতে পাইতাম যে, পুরুষের সৌন্দর্যের কাছে স্ত্রীলোকের রূপ কিছুই নয়। যদিও অন্তরের গুপ্ত ভাব বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করিতে মহিলাগণ অত্যন্ত সঙ্কুচিতা, তথাপি কার্য দ্বারা তাহাদিগের আন্তরিক গুঢ় তত্ত্বগুলি কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কে না দেখিয়াছে যে, সুন্দরীরা পরস্পরের সৌন্দর্য স্বীকার করিতে চাহেন না, অথচ পুরুষের ভক্ত হইয়া বসেন? ইহাতে কি বুঝাইতেছে না যে, মনে মনে তাহারা স্ত্রীলোকের রূপাপেক্ষা পুরুষের রূপের পক্ষপাতিনী?

রূপ, রূপ করিয়া স্ত্রীলোকের সর্বনাশ হই-

যাচ্ছে। সকলেই ভাবে রূপই কামিনীকুলের মহামূল্য ধন, রূপই কামিনীকুলের সর্বস্ব। সুতরাং মহিলাগণ যাহা কিছু কাম্য বস্তু প্রার্থনা করেন, লোকে কেবল রূপের বিনিময়েই দিতে চায়। ইহাতেই মনুষ্যসমাজের কলঙ্ক বারান্ধনা-বর্গের সৃষ্টি। ইহাতেই পরিবার মধ্যে স্ত্রী-লোকের দাসীত্ব।

অস্বাধী সৌন্দর্য্যই যোষিদমগুলীর এক মাত্র সম্বল, সংসার-সাগর পার হইবার এক মাত্র কাণ্ডারী, এ কথা আর আমি শুনিতে চাহি না। অনেক দিন শুনিয়াছি। শুনিয়া কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে। শুনিতে আর পারি না। আমি শুনিতে চাই যে, নারীজাতির রূপাপেক্ষা শত গুণে, সহস্র গুণে, লক্ষ গুণে, কোটি গুণে মহত্বের গুণ আছে। আমি শুনিতে চাই যে, তাঁহারা মূর্তিমতী সহিষ্ণুতা, ভক্তি ও প্রীতি। যঁহারা দেখিয়াছেন যে, কত কষ্ট সহ্য করিয়া জননী সম্ভানের লালন পালন করেন, যঁহারা দেখিয়াছেন যে, কত যত্নে মহিলাগণ পীড়িত আত্মীয়-বর্গের সেবা শুশ্রূষা করেন, তাঁহারা কামিনী-

কুলের সহিষ্ণুতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন ।
 ষাঁহারা কখন কোন সুন্দরীকে পতি পুত্রের জন্য
 জীবন বিসর্জন, ধর্ম বাহুস্থ বিসর্জন করিতে
 দেখিয়াছেন, তাঁহারা কিয়দূর বুঝিয়াছেন যে,
 কি রূপ প্রীতি ও ভক্তি স্ত্রীহৃদয়ে বসতি করে ।

যখন আমি উৎকৃষ্টা যোষিৎগের বিষয়ে
 চিন্তা করিতে যাই, তখনই আমার মানস-পটে
 সঁহ্মরণপ্রবৃত্তা সতীর মূর্তি জাগিয়া উঠে । আমি
 দেখিতে পাই যে, চিতা জ্বলিতেছে, পতির পদ
 সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত হতাশন
 মধ্যে সাধ্বী বসিয়া আছেন । আশ্তে আশ্তে
 বহি বিস্তৃত হইতেছে, এক অঙ্গ দক্ষ করিয়া
 অপর অঙ্গে প্রবেশ করিতেছে । অগ্নিদগ্ধা স্বামি-
 চরণ ধ্যান করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে হরিবোল
 বলিতে বলিতেছেন বা সঙ্কত করিতেছেন ।
 দৈহিক ক্লেশ-পরিচায়ক লক্ষণ নাই । আনন
 প্রফুল্ল । ক্রমে পাবকশিখা বাড়িল, জীবন
 ছাড়িল, কায়া ভস্মীভূত হইল । ধন্য সহিষ্ণুতা !
 ধন্য প্রীতি ! ধন্য ভক্তি !

যখন আমি ভাবি যে, কিছু দিন হইল আমা-

দিগের দেশীয়া অবলা অঙ্গনাগণ কোমলাঙ্গী
 হইয়াও এইরূপে মরিতে পারিত, তখন আমার
 মনে নূতন আশার সঞ্চার হয়, তখন আমার
 বিশ্বাস হয় যে, মহত্বের বীজ আমাদের অস্ত্র-
 রেও নিহিত আছে। কালেও কি আমরা মহত্ব
 দেখাইতে পারিব না? হে বঙ্গ পৌরাঙ্গনাগণ—
 তোমরা এ বঙ্গদেশের সার রত্ন! তোমাদের
 মিছা রূপের বড়াইয়ে কাজ কি?

নবম সংখ্যা ।

ফুলের বিবাহ ।

বৈশাখ মাস বিবাহের মাস । আমি ১লা বৈশাখে নশী বাবুর ফুলবাগানে বসিয়া একটি বিবাহ দেখিলাম । ভবিষ্যৎ বরকন্যাदिগের শিক্ষার্থ লিখিয়া রাখিতেছি ।

মল্লিকা ফুলের বিবাহ । বৈকাল শৈশব অবসান প্রায়, কলিক্কা কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়া আসিল । কন্যার পিতা বড় লোক নহে, ক্ষুদ্র বৃক্ষ, তাহাতে আবার অনেকগুলি কন্যাভার-গুস্ত । সম্বন্ধের অনেক কথা হইতেছিল, কিন্তু কোনটা স্থির হয় নাই । উদ্যানের রাজা স্থল-পদ্য নির্দোষ পাত্র বটে, কিন্তু ঘর বড় উঁচু, স্থল-পদ্য অত দূর নামিল না । জবা, এ বিবাহে অস-ম্মত ছিল না, কিন্তু জবা বড় রাগী, কন্যাকর্তা পিছাইলেন । গন্ধরাজ পাত্র ভাল, কিন্তু বড় দেমাগ, প্রায় তাঁহার বার পাওয়া যায় না । এই

রূপ অব্যবহার সময়ে ভ্রমররাজ ঘটক হইয়া মল্লিকারূক্ষসদনে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন,

“গুণ্ ! গুণ্ ! গুণ্ ! মেয়ে আছে ?”

মল্লিকারূক্ষ পাতা নাড়িয়া সায় দিলেন, “আছে !” ভ্রমর পত্রাসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, “গুণ্ গুণ্ গুণ্ ! গুণ্ গুণাগুণ্ ! মেয়ে দেখিব।”

রূক্ষ, শাখা নত করিয়া, মুদিতনয়না অবগুণ্ঠনবতী কন্যা দেখাইলেন।

ভ্রমর, এক বার রূক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া বলিলেন, “গুণ্ ! গুণ্ ! গুণ্ ! গুণ্ দেখিতে চাই। ঘোষটা খোল।”

লজ্জাশীলা কন্যা কিছুতেই ঘোষটা খুলে না। রূক্ষ বলিলেন, “আমার মেয়েগুলি বড় লাজুক। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি মুখ দেখাইতেছি।”

ভ্রমর ভেঁা করিয়া স্থলপদ্মের বৈঠকখানায় গিয়া রাজপুত্রের সঙ্গে ইয়ারকি করিতে বসিলেন। এ দিকে মল্লিকার সন্ধ্যা ঠাকুরাণী-দিদি

আসিয়া তাহাকে কত বুঝাইতে লাগিল—
বলিল, “দিদি, এক বার ঘোষটা খোল—নইলে,
বর আসিবে না—লক্ষ্মী আমার, চাঁদ আমার,
নোণা আমার” ইত্যাদি । কলিকা কত বার ঘাড়
নাড়িল, কত বার রাগ করিয়া মুখ ঘুরাইল, কত
বার বলিল, “ঠান্দিদি, তুই যা !” কিন্তু শেষে
সঙ্ক্যার স্নিগ্ধ স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া মুখ খুলিল ।
তখন ঘটক মহাশয় ভেঁা করিয়া রাজবাড়ী
হইতে নামিয়া আসিয়া ঘটকালীতে মন
দিলেন । কন্যার পরিমলে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন,
“গুণ্ গুণ্ গুণ্, গুণ্ গুণাগুণ্ ! কন্যা গুণবতী বটে ।
ঘরে মধু কত ?”

কন্যাকর্ত্তা রুক্ষ বলিলেন, “ফর্দ দিবেন,
কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিব ।” ভ্রমর বলিলেন,
“গুণ্ গুণ্, আপনার অনেক গুণ্—ঘট
কালীটা ?”

কন্যাকর্ত্তা শাখা নাড়িয়া সায় দিল, “তাও
হবে ।”

ভ্রমর—“বলি ঘটকালীর কিছু আগাম দিলে
হয় না ? নগদ দান বড় গুণ্—গুণ্ গুণ্ গুণ্ ।”

ক্ষুদ্র বৃক্ষটি তখন বিরক্ত হইয়া, সকল শাখা নাড়িয়া বলিল, “আগে বরের কথা বল—বর কে?”

ভ্রমর—“বর অতি সুপাত্র।—তঁার অনেক গুণ-ন্-ন্।”

“কে তিনি?”

“গোলাবলাল গঙ্কোপাধ্যায়। তঁার অনেক—গুণ-ন্-ন্।”

এ সকল কথোপকথন মনুষ্যে শুনিতে পায় না, আমি কেবল আফিম প্রসাদাৎ দিব্য কণ্ঠ পাইয়াই, এ সকল শুনিতেছিলাম। আমি শুনিতে লাগিলাম, কুলাচার্য মহাশয়, পাখা ঝাড়িয়া, ছয় পা ছড়াইয়া গোলাবের মহিমা কীর্তন করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন যে, গোলাব বংশ বড় কুলীন; কেন না ইহার “ফুলে” মেল। যদি বল সকল ফুলই ফুলে, তথাপি গোলাবের গৌরব অধিক, কেন না ইহার সান্ধাৎ বাঞ্ছামালীর সম্ভান; তাহার সহস্ররোপিত। যদি বল এ ফুলে কাটা আছে, কোন্ কুলে বা কোন্ ফুলে নাই?

যাহা হউক, ঘটকরাজ কোনরূপে সম্বন্ধ স্থির করিয়া বেঁা করিয়া উড়িয়া গিয়া, গোলাব বাবুর বাড়ীতে খবর দিলেন । গোলাব, তখন বাতাসের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, লাফাইয়া লাফাইয়া খেলা করিতেছিল, বিবাহের নাম শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া কন্যার বয়স জিজ্ঞাসা করিল । ভ্রমর বলিল, “আজি কালি ফুটিবে ।”

গোধূলি লগ্ন উপস্থিত, গোলাব বিবাহে যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । উচ্চিঙ্গড়া নহবৎ বাজাইতে আরম্ভ করিল ; মৌমাছি সানাইয়ের বায়না লইয়াছিল, কিন্তু রাতকাণা বলিয়া সঙ্গে যাইতে পারিল না । খদ্যোতেরা ঝাড় ধরিল ; আকাশে তারাবাজি হইতে লাগিল । কোকিল আগে আগে কুকরাইতে লাগিল । অনেক বরযাত্র চলিল ; স্বয়ং রাজকুমার স্থলপদ্য দিবাবসানে অসুস্থকর বলিয়া আমিতে পারিলেন না, কিন্তু জ্বা গোষ্ঠী—শ্বেত জ্বা, রক্ত জ্বা, জ্বরদ জ্বা প্রভৃতি সবংশে আমিয়াছিল । করবীরের দল, সেকেলে রাজাদিগের মত বড়

উচ্চ ডালে চড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।
 সৈঁউতি নীতবর হইবে বলিয়া, সাজিয়া আসিয়া
 ছুলিতে লাগিল। গরদের জোড় পরিয়া চাঁপা
 আসিয়া দাঁড়াইল—বেটা ত্রাণ্ডি টানিয়া আসিয়া-
 ছিল, উগ্র গন্ধ ছুটিতে লাগিল। গন্ধরাজেরা
 বড় বাহার দিয়া, দলে দলে আসিয়া, গন্ধ বিলা-
 ইয়া দেশ মাতাইতে লাগিল। অশোক, নেশায়
 লাল হইয়া আসিয়া উপস্থিত ; সঙ্গে এক পাল
 পিপড়া মোসাম্বেব হইয়া আসিয়াছে ; তাহাদের
 গুণের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, কিন্তু দাঁতের জ্বালা
 বড়—কোন্ বিবাহে না একরূপ বরষাত্র জোটে,
 আর কোন্ বিবাহে না তাহারা হল ফুটাইয়া
 বিবাদ বাঁধায়? কুরুবক, কুটজ প্রভৃতি আরও
 অনেক বরষাত্র আসিয়াছিলেন, ঘটক মহাশয়ের
 কাছে তাহাদের পরিচয় শুনিবেন। সর্বত্রই
 তিনি যাতায়াত করেন এবং কিছু কিছু মধু
 পাইয়া থাকেন।

আমারও নিমন্ত্রণ ছিল, আমিও গেলাম।
 দেখি বরপক্ষের বড় বিপদ। বাতাস, বাহকের
 বায়না লইয়াছিলেন ; তখন হুঁ—হুঁ করিয়া

অনেক মর্দানি করিয়াছিলেন, কিন্তু কাজের সময়ে কোথায় লুকাইলেন, কেহ খুঁজিয়া পায় না। দেখিলাম বর, বরযাত্র, সকলে অবাক হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। মল্লিকা-দিগের কুল যায় দেখিয়া, আমিই বাহকের কার্য স্বীকার করিলাম। বর, বরযাত্র সকলকে তুলিয়া লইয়া মল্লিকাপুরে গেলাম।

সেখানে দেখিলাম, কন্যাকুল, সকল ভগিনী, আছলাদে ঘোমটা খুলিয়া, মুখ ফুটাইয়া, পরিমল ছুটাইয়া, সুখের হাসি হাসিতেছে। দেখিলাম, পাতায় পাতায় জড়াজড়ি, গন্ধের ভাণ্ডারে ছড়া-ছড়ি পড়িয়া গিয়াছে—রূপের ভরে সকলে ভাসিয়া পড়িতেছে। যুধি, মালতী, বকুল, রজনীগন্ধ প্রভৃতি এযোগণ স্ত্রী-আচার করিয়া বরণ করিল। দেখিলাম, পুরোহিত উপস্থিত ; নশীবাবুর নবমবর্ষীয়া কন্যা (জীবন্ত কুম্ভ-রূপিণী) কুম্ভমলতা সূচ সূতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে ; কন্যাকর্তা কন্যা সম্প্রদান করিলেন ; পুরোহিত মহাশয় দুই জনকে এক সূতার গাঁথিয়া গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিলেন।

তখন বরকে বাসর-ঘরে লইয়া গেল । কত যে রসময়ী মধুময়ী সুন্দরী মেখানে বরকে ঘেরিয়া বসিল, তাহা কি বলিব । প্রাচীনা ঠাকুরাণীদিদি টগর শাদা প্রাণে বাঁধা রসিকতা করিতে করিতে শুকাইয়া উঠিলেন । রঙ্গণের, রাস্তা মুখে হাসি ধরে না । যুই, কন্যের সহি, কন্যের কাছে গিয়া শুইল ; রজনীগন্ধকে বর তাড়কা রাস্কসী বলিয়া কত তামাসা করিল ; বকুল, একে বালিকা, তাতে যত গুণ, তত রূপ নহে ; এক কোণে গিয় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল ; আর বুঝকা ফুল বড় মানুষের গৃহিণীর যত মোটা মাগী নীল শাড়ী ছড়াইয়া জমকাইয়া বসিল । তখন—

“কমল কাকা—ওঠ, বাড়ী যাই—রাত হয়েছে, ওকি চলে পড়বে যে ?”

কুমলতা এই কথা বলিয়া আমার গা ঠেলিতেছিল ;—চমক হইলে, দেখিলাম কিছুই নাই । সেই পুষ্পবাসর কোথায় মিশিল ?—মনে করিলাম, সংসার অনিত্যই বটে—এই আছে এই নাই । সে রম্য বাসর কোথায় গেল,—সেই হাস্যমুখী শুভ স্মিত সুধাময়ী পুষ্পসুন্দরী

সকল কোথায় গেল ? যেখানে সব যাইবে,
সেইখানে—স্মৃতির দর্পণতলে, ভূতসাগরগর্ভে ।
যেখানে রাজা প্রজা, পর্বত সমুদ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদি
গিয়াছে বা যাইবে, সেইখানে—ধ্বংসপুরে । এই
বিবাহের ন্যায় সব শূন্যে মিশাইবে, সব বাতাসে
গলিয়া যাইবে—কেবল থাকিবে—কি ? ভোগ ?
না, ভোগ্য না থাকিলে ভোগ থাকিতে পারে
না । তবে কি ? স্মৃতি ?

কুসুম বলিল, “ওঠ না—কি কচ্চো ?”

আমি বলিলাম, “দূর পাগলি, আমি বিয়ে
দিচ্ছিলাম ।”

কুসুম ঘেসে এসে, হেসে হেসে কাছে দাঁড়া-
ইয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কার বিয়ে,
কাকা ?”

আমি বলিলাম, “ফুলের বিয়ে ?”

“ওঃ পোড়া কপাল, ফুলের ? আমি বলি
কি ! আমিও যে এই ফুলের বিয়ে দিয়েছি ।”

“কই ?”

“এই যে মালা গাঁথিয়াছি ।” দেখিলাম,
সেই মালায় আমার বর কন্যা রহিয়াছে ।

বড় বাজার ।

প্রসন্ন গোয়ালিনীর সঙ্গে আমার চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখিতেছি । আমি নশীরাম বাবুর গৃহে আসিয়া অবধি, তাহার নিকট ক্ষীর সর, দধি দুধ এবং নবনীত খাইতেছি । আহারকালে মনে করিতাম, প্রসন্ন কেবল পরলোকে সদগতির কামনায় অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে ;—জানিতাম, সংসারারণ্যে যাহারা পুণ্যরূপ মৃগ ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া বেড়ায়, প্রসন্ন তন্মধ্যে সূচতুরা ; ভোজনাশ্তে নিত্যই প্রসন্নের পরকালে অক্ষয় স্বর্গ, এবং ইহকালে মোতাত বৃদ্ধির জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতাম । কিন্তু এক্ষণে হায় ! মানব-চরিত্র কি ভীষণ স্বার্থপরতায় কলঙ্কিত ! এক্ষণে সে মূল্য চাহিতেছে !

সুতরাং তাহার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা । প্রথম দিন সে যখন মূল্য চাহিল, রসিকতা করিয়া উড়াইয়া দিলাম—দ্বিতীয় দিনে বিস্মিত হইলাম—তৃতীয় দিনে গালি দিয়াছি ।

এক্ষণে সে দুধ দই বন্ধ করিয়াছে । কি ভয়ানক ! এত দিনে জানিলাম, মনুষ্যজাতি নিতান্ত স্বার্থপর ; এত দিনে জানিয়াছি, যে সকল আশা ভরসা সম্বন্ধে হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া বিশ্বাস-জলে পুষ্টি কর, সকলই বৃথা ! এক্ষণে জানিয়াছি যে, ভক্তি প্রীতি স্নেহ প্রণয়াদি সকলই বৃথা গল্প—আকাশকুম্ভ ! ছায়াবাজি ! হায় ! মনুষ্য-জাতির কি হইবে ! হায়, অর্থলুব্ধ গোয়াল-জাতিকে কে নিস্তার করিবে ! হায় ! প্রসন্ন নামে গোয়ালার কবে গোরু চুরি যাবে !

প্রসন্নের দুগ্ধ দধি আছে, সে দিবে, আমার উদর আছে, খাইব, তাহার সঙ্গে এই সন্দ্বন্ধ, ইহাতে সে মূল্য চাহে কোন্ অধিকারে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না । প্রসন্ন বলে, আমি অধিকার অনধিকার বুঝি না ; আমার গোরু, আমার দুধ, আমি মূল্য লইব । সে বুঝে না যে, গোরু কাহারও নহে ; গোরু, গোরুর নিজেই ; দুধ, যে খায় তারই ।

তবে এ সংসারে মূল্য লওয়া একটা রীতি আছে, স্বীকার করি । কেবল ষাদ্যসামগ্রী কেন,

সকল সামগ্রীই মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়। দুধ দই, চাল দাল, খাদ্য পেয়, পরিধেয় প্রভৃতি পণ্য দ্রব্য দূরে থাকুক, বিদ্যা বুদ্ধিও মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। কালেজে মূল্য দিয়া বিদ্যা কিনিতে হয়। অনেকে ভাল কথা মূল্য দিয়া কিনিয়া থাকেন। হিন্দুরা সচরাচর মূল্য দিয়া ধর্ম কিনিয়া থাকেন। যশঃ মান অতি অল্প মূল্যেই ক্রীত হইয়া থাকে। ভাল সামগ্রী মূল্য দিয়া কিনিতে হইবে, ইহাও কতক বুঝিতে পারি, কিন্তু মনুষ্য এমনই মূল্যপ্রিয়, যে বিনামূল্যে মন্দ সামগ্রীও কেহ কাহাকে দেয় না। যে বিষ খাইয়া মরিবার বাসনা কর, তাহাও তোমাকে বাজার হইতে মূল্য দিয়া, কিনিয়া খাইতে হইবে।

অতএব এই বিশ্বসংসার, একটি বৃহৎ বাজার—সকলেই সেখানে আপনাপন দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। সকলেরই উদ্দেশ্য মূল্যপ্রাপ্তি। সকলেই অনবরত ডাকিতেছে, “আমার দোকানে ভাল জিনিষ—খরিদার চলে আয়”—সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য, খরিদারের

চোকে ধূলা দিয়া রদি ঝাল পাচার করিবে ।
দোকানদার খরিদারে কেবল যুদ্ধ, কে কাকে
ফাঁকি দিতে পারে । সস্তা খরিদের অবিরত
চেষ্ঠাকে মনুষ্যজীবন বলে ।

ভাবিয়া চিন্তিয়া, মনের দুঃখে আফিমের
মাত্রা চড়াইলাম । তখন জ্ঞাননেত্র ফুটিল ।
সম্মুখে ভবের বাজার সুবিস্তৃত দেখিলাম । দেখি-
লাম, অসংখ্য দোকানদার, দোকান সাজাইয়া
বসিয়া আছে—অসংখ্য খরিদারে খরিদ করি-
তেছে—দেখিলাম, সেই অসংখ্য দোকানদারে
অসংখ্য খরিদারে পরস্পরকে অসংখ্য অঙ্গুষ্ঠ
দেখাইতেছে । আমি গামছা কাঁধে করিয়া,
বাজার করিতে বাহির হইলাম । প্রথমেই রূপের
দোকানে গেলাম । যে জিনিষ ঘরে নাই, সেই
দোকানে আগে যাইতে হয় ।—দেখিলাম যে,
সংসারের সেই মেছো হাটা । পৃথিবীর রূপসীগণ
যাছ হইয়া ঝুড়ি চুপড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া-
ছেন । দেখিলাম, ছোট বড় রুই কাতলা, মৃগেল
ইলিস, চুনো পুঁটি, কই, মাগুর খরিদারের অন্ত
লেজ আছড়াইয়া ধড় ফড় করিতেছে ; যত

বেলা বাড়িতেছে, তত বিক্রয়ের জন্য খাবি
 খাইতেছে। —মেছনীরা ডাকিতেছে, “মাছ
 নেবে গো! কুল পুকুরের সস্তা মাছ, অমনি
 ছাড়ব—বোঝা বিক্রী হলেই বাঁচি।” কেহ
 ডাকিতেছে, “মাছ নেবে গো—ধন সাগরের
 মিঠা মাছ—যে কেনে তার পুনর্জন্ম হয়
 না—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিবির মুণ্ডে পরি-
 ণত হইয়া তার ঘর দ্বারে ছড়াছড়ি যায়, যার
 সাধ্য থাকে কিনিবে। সোণার হাঁড়িতে চোখের
 জলে সিদ্ধ করিয়া, হৃদয়-আগুনে কড়া জ্বাল
 দিয়া রাখিতে হয়—কে খরিদার সাহস
 করিস্—আয়। সাবধান! হীরার কাঁটা—নাতি
 কাঁটা—গলায় বাঁধলে শ্বশুড়ীরূপী বিড়ালের
 পায়ে পড়িতে হয়—কাঁটার জ্বালায়, খরিদার
 হলে কি পলায়!” কেহ ডাকিতেছে, “ওরে
 আমার সরম পুঁটি, বিক্রী হলেই উঠি। ঝোলে
 ঝালে অম্বলে, তেলে ঘিয়ে জলে, যাতে দিবে
 ফেলে, রান্না যাবে চলে,—সংসারের দিন সুখে
 কাটাবে, আমার এই সরম পুঁটির বলে।” কেহ
 বলিতেছে, “কাদা ছেঁচে চাঁদা এনেছি—দেখে

খরিদার পাগল হয় ! কিনে নিয়ে ঘর আলো কর ।”

এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া মাছ কিনিতে প্রবৃত্ত হইলাম—কেন না আমার নিরামিষ ঘর করনা । দেখিলাম, মাছের দালাল আছে ; নাম পুরোহিত । দালাল খাড়া হইলে দর জিজ্ঞাসা করিলাম—শুনলাম, দর “জীবন সর্বস্ব ।” যে মাছ ইচ্ছা সেই মাছ কেন, একই দর, “জীবন সর্বস্ব ।” জিজ্ঞাসা করিলাম, “ভাল, এ মাছ কত দিন খাইব ?” দালাল বলিল, “দুদিন চারি দিন, তার পর পচিয়া গন্ধ হইবে ।” তখন “এত চড়া দরে, এমন নশ্বর সামগ্রী কেন কিনিব ?” ভাবিয়া আমি মেছো হাটা হইতে পলায়ন করিলাম । দেখিয়া মেছনীরা গামছা কাঁধে মিন্‌সেকে গালি পাড়িতে লাগিল ।

রূপের বাজার ছাড়িয়া বিদ্যার বাজারে গেলাম । দেখিলাম, এখানে ফলমূল বিক্রয় হয় । এক স্থানে দেখিলাম, কতকগুলি ফোঁটা-কাটা টিকিওয়ালা ব্রাহ্মণ তসর গরদ পরিয়া, নামাবলি গায়ে, বুনা নাথিকেলের দোকান খুলিয়া বসিয়া

খরিদ্দার ডাকিতেছেন—“বেচি আমরা ঘটু পটু বটু গটু—ঘরে চাল থাকিলেই স্ব-ত্ব, নইলে ন-ত্ব । দ্রব্যত্ব জাতিত্ব গুণত্ব পদার্থ—রাপের শ্রাঙ্কে বিদায় না দিলেই তুমি বেটা অপদার্থ । পদার্থতত্ত্ব নামে বুনা নারিকেল—খাইতে বড় কঠিন—তাহার প্রথম ছোবড়ায় লেখে যে, ব্রাহ্ম-ণীই পরম পদার্থ । অভাব নামে নারিকেল চতুর্বিধ*—তোমার ঘরে ধন আছে, আমার ঘরে নাই, ইহা অন্যান্যাতাব । যত ক্ষণ না পাই, তত ক্ষণ প্রাগভাব ; খরচ হইয়া গেলেই ধ্বংসাতাব ; আর আমাদের ঘরে সর্বদাই অত্যন্ত অভাব । অভাব নিত্য কি অনিত্য যদি সংশয় থাকে, তবে আমাদের ভাণ্ডারে উঁকি মার—দেখিবে, নিত্যই অভাব । অতএব আমাদের বুনা নারিকেল কেন । ব্যাপ্য, ব্যাপক, ব্যাপ্তি, এ নারিকেলের শাস, ব্রাহ্মণের হস্ত হইল ব্যাপ্য, রজত হইল

* নৈয়ারিকেরা বলেন, অভাব চতুর্বিধ ; অন্যান্যাতাব, প্রাগভাব, ধ্বংসাতাব, আর অত্যন্তাতাব ।

শ্রীকমলাকান্ত ।

ব্যাপক ; আর তুমি দিলেই ঘটিল ব্যাপ্তি ; এই ঝুনা নারিকেল কেন, এখনই বুঝবে । দেখ, বাপু, কার্য কারণ সম্বন্ধ বড় গুরুতর কথা ; টাকা দাও, এখনই একটা কার্য হইবে, কম দিলেই অকার্য । আর কারণ বুঝাইব কি, এই যে দুই প্রহর রৌদ্রে ঝুনা নারিকেল বেচিতে আসিয়াছি, ব্রাহ্মণীই তাহার কারণ—কিছু যদি না কেন, তবে নারিকেল বহা,—অকারণ । অতএব নারিকেল কেন, নহিলে এই ঝুনা নারিকেল মাথায় ঠুকিয়া মরিব ।”

ব্রাহ্মণদিগের সেই প্রথর তপনতপ্ত ঘর্ম্মাক্ত ললাট এবং বাগ্‌বিতণ্ডাজনিত অধর-সুধাবৃষ্টি দেখিয়া দয়া হইল—জিজ্ঞাসা করিলাম, “হাঁ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ! ঝুনা নারিকেল কিনিতে আপত্তি নাই, কিন্তু দোকানে দা আছে ? ছুলিবে কি প্রকারে ?”

“না বাপু, দা রাখি না ।”

“তবে নারিকেল ছোল কিসে ?”

“আমরা ছুলি না—আমরা কামড়াইয়া ছোবড়া খাই ।”

শুনিয়া, আমি ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া
পাশের দোকানে গেলাম।

দেখিলাম, ইহাদিগের সম্মুখেই একপেরি-
মেটেল সায়েন্সের দোকান। কতকগুলি সাহেব
দোকানদার, ঝুনা নারিকেল, বাদাম, পেস্তা,
সুপারি প্রভৃতি ফল বিক্রয় করিতেছেন। ঘরের
উপরে বড় বড় পিতলের অঙ্করে লেখা আছে।

**MESSRS BROWN JONES AND
ROBINSON**

NUT SUPPLIERS

ESTABLISHED 1757

ON THE FIELD OF PLASSEY.

MESSRS BROWN JONES AND ROBINSON,

offer to the Indian Public

A Large Assortment of

NUTS.

PHYSICAL, METAPHYSICAL,

LOGICAL, ILLOGICAL,

AND

SUFFICIENT TO BREAK THE JAWS

and

DISLOCATE THE TEETH OF

ALL INDIAN YOUTHS

WHO STAND IN NEED OF HAVING THEIR

DENTAL SUPERFLUITIES CURTAILED.

দোকানদার ডাকিতেছেন—“আয় কাল।
 বালক Experimental Science খাবি আয় । দেখ,
 ১নম্বর এক্সপেরিমেন্ট—ঘুমি; ইহাতে দাঁত উপড়ে,
 মাথা ফাটে এবং হাড় ভাঙ্গে । আমরা এ সকল
 এক্সপেরিমেন্ট বিনামূল্যে দেখাইয়া থাকি—পরের
 মাথা বা নরম হাড় পাইলেই হইল । আমরা
 স্থূল পদার্থের সংযোগ বিয়োগ সাধনে পটু—
 রাসায়নিক বলে, বা বৈদ্যুতীয় বলে, বা চৌম্বক
 বলে, জড়পদার্থের বিশ্লেষণেই সুদক্ষ—কিন্তু
 সর্বাপেক্ষা মুণ্ড্যাঘাতের বলে মস্তকাদির বিশ্লেষণেই
 আমরা কৃতকার্য । মাধ্যাকর্ষণ, যৌগিক-
 কর্ষণ, চৌম্বকাকর্ষণ প্রভৃতি নানাবিধ আকর্ষণের
 কথা আমরা অবগত আছি, কিন্তু সর্বাপেক্ষা
 কেশাকর্ষণেই আমরা কৃতবিদ্য । এই সংসারে
 জড়পদার্থের নানাবিধ যোগ দেখা যায় ; যথা
 বায়ুতে অগ্নিজান ও যবক্ষারজানের সামান্য যোগ,
 জলে জলজান ও অগ্নিজানের রাসায়নিক যোগ,
 আর তোমাদিগের পৃষ্ঠে, আমাদের হস্তে, মুষ্টি-
 যোগ । অতএব, এই সকল আশ্চর্য ব্যাপার
 দেখিবে যদি, মাথা বাড়াইয়া দাও ; এক্সপেরি-

মেন্ট করিব । দেখিবে, গ্রাবিটেশ্যনের বলে এই সকল নারিকেলাদি তোমাদের মস্তকে পড়িবে ; পর্কশন্ নামক অদ্ভুত শাব্দিক রহস্যেরও পরিচয় পাইবে, এবং দেখিবে, তোমার মস্তিষ্কস্থিত স্নায়ব পদার্থের গুণে তুমি বেদনা অনুভূত করিবে ।

অগ্নিম মূল্য দিও ; তাহা হইলে চ্যারিটিতে এক্সপেরিমেন্ট খাইতে পারিবে ।”

আমি এই সকল দেখিতে শুনিতেছিলাম, এমত সময়ে, সহসা দেখিলাম যে, ইংরেজ দোকানদারেরা, লাঠী হাতে, দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণ-দিগের বুন্য নারিকেলের গাদার উপর গিয়া পড়িলেন, দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা নারিকেল ছাড়িয়া দিয়া, নামাবলী ফেলিয়া, মুক্তকচ্ছ হইয়া উর্দ্ধ্বাঙ্গে পলায়ন করিতে লাগিলেন । তখন সাহেবেরা সেই সকল পরিত্যক্ত নারিকেল দোকানে উঠাইয়া লইয়া আসিয়া, বিলাতী অস্ত্রে ছেদন করিয়া, সুখে আহার করিতে লাগিলেন । আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, “এ কি হইল ?” সাহেবেরা বলিলেন, “ইহাকে বলে, Asiatic Researches.” আমি তখন ভীত হইয়া, আত্মশরীরে কোন

প্রকার Anatomical researches আশঙ্ক্য করিয়া, সেখান হইতে পলায়ন করিলাম।

সাহিত্যের বাজার দেখিলাম। দেখিলাম, বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণ অমৃত ফল বেচিতেছেন, বুঝিলাম, ইহা সংস্কৃত সাহিত্য; দেখিলাম, আর কতকগুলি মনুষ্য নীচু পীচ পেয়ারা আনারস আঙ্গুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল বিক্রয় করিতেছেন—বুঝিলাম, এ পাশ্চাত্য সাহিত্য। আরও একখানি দোকান দেখিলাম—অসংখ্য শিশুগণ এবং অবলাগণ তাহাতে ক্রয় বিক্রয় করিতেছে—ভিড়ের জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না—জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কিমের দোকান ?

বালকেরা বলিল, “বাঙ্গালা সাহিত্য।”

“বেচিতেছে কে ?”

“আমরাই বেচি। দুই এক জন বড় মহাজনও আছেন। তন্মধ্যে বাজে দোকানদারের পরিচয় পশ্চাবলী নামক গ্রন্থে পাইবেন।”

“কিনিতেছে কে ?”

“আমরাই।”

বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল।
দেখিলাম—খবরের কাগজ জড়ান কতকগুলি
অপক্ব কদলী।

তাহার পরে কলু পড়িতে গেলাম। দেখি-
লাম, যত উমেদার, মোসাম্বেব, সকলে কলু
সাজিয়া তেলের ভাঁড় লইয়া সারি সারি বসিয়া
গিয়াছে। তোমার ট্যাকে চাকরি আছে, শুনিতে
পাইলেই, পা টানিয়া লইয়া, ভাঁড় বাহির
করিয়া, তেল মাখাইতে বসে। চাকরি না থাকি-
লেও—যদি থাকে, এই ভরসায়, পা টানিয়া
লইয়া, তেল লেপিতে বসে। তোমার কাছে
চাকরি নাই—নাই নাই—নগদ টাকা আছে
ত—আচ্ছা, তাই দাও—তেল দিতেছি। কাহারও
প্রার্থনা, তোমার বাগানে বসিয়া তুমি যখন
ব্রাণ্ডি খাইবে, আমি তোমার চরণে তৈল মাখা-
ইব—আমার কন্যার বিবাহটি যেন হয়। কাহারও
আদাশ, তোমার কানে অবিরত খোষামোদের
গন্ধ তৈল ঢালিব—বাড়ীর প্রাচীরটি যেন দিতে
পারি। কাহারও কামনা, তোমার তোষাখানার
বাতি জ্বালিয়া দিব—আমার খবরের কাগজখানি

যেন চলে । শুনিয়াছি, কলুদিগের টানাটানিতে অনেকের পা খোঁড়া হইয়া গিয়াছে । আমার শঙ্কা হইল, পাছে কোন কলু আফিসের প্রার্থনায় আমার পায়ে তেল দিতে আরম্ভ করে । আমি পলায়ন করিলাম ।

তার পরে ময়রাপাটী । সম্বাদপত্রলেখক নামে ময়রাগণ, গুড়ে সন্দেশের দোকান পাতিয়া, নগদ মূল্যে বিক্রয় করিতেছে—রাস্তার লোক ধরিয়া সন্দেশ গতাইয়া দিয়া, হাত পাতিতেছে—মূল্য না পাইলেই কাপড় কাড়িয়া লইতেছে । এ দিকে তাঁহাদের বিক্রয় যশের দুর্গন্ধে পথিক নাসিকা আবৃত করিয়া পলায়ন করিতেছে । দোকানদারগণ বিনা ছানায়, শুধু গুড়ে, আশ্চর্য্য সন্দেশ করিয়া সস্তা দরে, বিক্রয় করিতেছেন । কেহ টাকাটা সিকেটায় আনা দু আনার, কেহ কেবল খাতিরে—কেহ বা এক সাঁজ ফলাহার পেলেই, ছাড়েন—কেহ বা বাবুর গাড়িতে চড়িতে পেলেই যশোবিক্রয় করেন । অন্যত্র রাজপুরুষ-গণ মিঠাইওয়ালা সাজিয়া, রায়বাহাদুর, রাজা-বাহাদুর খেতাব, খেলাত, নিমন্ত্রণ, ধন্যবাদ

প্রভৃতি মিঠাই লইয়া দোকান পাতিয়া বসিয়া
 আছেন,—চাঁদা, সেলাম, খোষামোদ, ডাক্তার-
 খানা, রাস্তাঘাট, মূল্য লইয়া মিঠাই বেচিতে-
 ছেন । বিক্রয়ের বড় বেবন্দোবস্ত—কেহ সর্বস্ব
 দিয়া এক ঠোঙ্গা পাইতেছে না—কেহ শুধু
 সেলামে দেড় মন লইয়া যাইতেছে । এইরূপ
 অনেক দোকান দেখিলাম—কিন্তু সর্বত্রই
 পচা মাল আধা দরে বিক্রয় হইতেছে—খাঁটি
 দোকান দেখিলাম না । কেবল একখানি দোকান
 দেখিলাম—তাহা অতি চমৎকার ।

দেখিলাম দোকানের মধ্যে নিবিড় অন্ধ-
 কার—কিছু দেখা যায় না । ডাকিয়া দোকান-
 দারের উত্তর পাইলাম না—কেবল এক সর্ব-
 প্রাণিভীতিসাধক অনন্ত গর্জন শুনিতে পাই-
 লাম—অল্পালোকে দ্বারে ফলক-লিপি পড়ি-
 লাম ।

যশের পণ্যশালা ।

বিক্রেয়—অনন্ত যশ ।

বিক্রেতা—কাল ।

মূল্য—জীবন ।

জীবনে কেহ এখানে প্রবেশ করিতে পারে না ।

আর কোথাও সূষণ বিক্রয় হয় না ।

পড়িয়া ভাবিলাম—আমার যশে কাজ নাই—
কমলাকান্তের প্রাণ বাঁচিলে অনেক যশ হইবে ।

বিচারের বাজারে গেলাম—দেখিলাম সেটা
কসাইখানা । টুপি মাথায়, শামলা মাথায়—
ছোট বড় কসাই সকল, ছুরি হাতে গোরু কাটি-
তেছে । মহিষাদি বড় বড় পশু সকল শৃঙ্গ
নাড়িয়া ছুটিয়া পলাইতেছে ;—ছাগ মেষ এবং
গোরু প্রভৃতি ক্ষুদ্র পশু সকল ধরা পড়িতেছে ।
আমাকে দেখিয়া গোরু বলিয়া এক জন কসাই
বলিল, “এও গোরু, কাটিতে হইবে ।” আমি
সেলাম করিয়া পলাইলাম ।

আর বড় বাজার বেড়াইবার সাধ রহিল না
—তবে প্রসন্নের উপর রাগ ছিল বলিয়া এক বার
দইয়েহাটা দেখিতে লাগিলাম—গিয়া প্রথমেই
দেখিলাম যে সেখানে খোদ কমলাকান্ত চক্র-
বর্তী নামে গোয়ালী—দপ্তররূপ পচা ঘোলের
হাঁড়ি লইয়া বসিয়া আছে—আপনি ঘোল খাই-
তেছে, এবং পরকে খাওয়াইতেছে ।

তখন চমক হইল—চক্ষু চাহিলাম—দেখি-
লাম, নশী বাবুর বাড়ীতেই আছি । ঘোলের
হাঁড়ি কাছে আছে বটে । প্রসন্ন এক হাঁড়ি
ঘোল আনিয়া আমাকে সাধিতেছে—“চক্রবর্তী
মশাই—রাগ করিও না । আজ আর দুধ দই
নাই—এই ঘোলটুকু আনিয়াছি—ইহার দাম
দিতে হইবে না ।”

একাদশ সংখ্যা ।

আমার দুর্গোৎসব ।

সপ্তমীপূজার দিন কে আমাকে এত আফিস
চড়াইতে বলিল ! আমি কেন আফিস খাই-
লাম ! আমি কেন প্রতিমা দেখিতে গেলাম !
যাহা কখন দেখিব না, তাহা কেন দেখিলাম !
এ কুক কে দেখাইল !

দেখিলাম—অকস্মাৎ কালের স্রোত, দিগন্ত
ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে—আমি ভেলায়
চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি । দেখিলাম—অনন্ত,
অকূল, অন্ধকারে, বাত্যাবিষ্কৃত তরঙ্গসঙ্কল সেই
স্রোত—মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয়
হইতেছে, নিবিত্তেছে—আবার উঠিতেছে ।
আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয় করিতে
লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—মা ! মা !
করিয়া ডাকিতেছে । আমি এই কাল-সমুদ্রে

মাতৃসন্ধানে আসিতেছি। কোথা মা! কই
 আমার মা? কোথায় কমলাকান্তপ্রসূতি বঙ্গ-
 ভূমি! এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি?
 সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরক্ত পরিপূর্ণ হইল—
 দিগ্গোলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল
 আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—
 সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে
 দেখিলাম—স্বর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া
 প্রতিমা। জলে, হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক
 বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা? হাঁ, এই মা।
 চিনিলাম, এই আমার জননীজন্মভূমি—এই মৃগয়ী
 —মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কাল
 গর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশ দিক্
 —দশ দিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধ-
 রূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু
 বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রু-
 নিস্পীড়নে নিযুক্ত। এ মূর্তি এখন দেখিব না
 —আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কাল-
 স্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু এক
 দিন দেখিব—দিগ্ভুজা, নানা প্রহরণপ্রহারিণী,

শক্রমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী
ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী,
সঙ্ক্ষে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ,
আমি সেই কাল শ্রোতোমধ্যে দেখিলাম এই
সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা !

কোথায় ফুল পাইলাম বলিতে পারি না—
কিন্তু সেই প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম
—ডাকিলাম, “সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে, আমার
সর্বার্থ সাধিকে ! অসংখ্য সন্তানকুলপালিকে !
ধর্ম্ম, অর্থ, সুখ, দুঃখদায়িকে ! আমার পুষ্পা-
ঞ্জলি গ্রহণ কর ! এই ভক্তি প্রীতি বৃত্তি শক্তি
করে লইয়া তোমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি
দিতেছি, তুমি এই অনন্তজলমণ্ডল ত্যাগ
করিয়া এই বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি একবার জগৎ
সমীপে প্রকাশ কর । এসো মা ! নবরাগ-
রঙ্গিণি, নব বলধারিণি, নব দর্পে দর্পিণি, নব-
স্বপ্নদর্শিণি ।—এসো মা, গৃহে এসো—ছয়কোটি
সন্তানে একত্রে, এক কালে, দ্বাদশকোটি কর
যোড় করিয়া, তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব ।
ছয় কোটি মুখে ডাকিব, মা প্রসূতি অম্বিকে !

ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্যদায়িকে ! নগাক্কশোভিনি
 নগেন্দ্রবালিকে ! শরৎসুন্দরি চারুপূর্ণচন্দ্রভালিকে !
 ডাকিব,—সিন্ধু-সেবিতে সিন্ধু-পূজিতে সিন্ধু-
 মখনকারিণি ! শত্রুবধে দশভূজে দশপ্রহরণ-
 ধারিণি ! অনন্তশ্রী অনন্ত কালস্থায়িনি ! শক্তি
 দাও সন্তানে, অনন্তশক্তিপ্রদায়িনি ! তোমায়
 কি বলিয়া ডাকিব মা ? এই ছয় কোটি যুগে ঐ
 পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব—এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ
 নাম করিয়া হুঙ্কার করিব,—এই ছয় কোটি দেহ
 তোমার জন্য পতন করিব—না পারি, এই দ্বাদশ
 কোটি চক্ষু তোমার জন্য কাঁদিব । এসো মা,
 গৃহে এসো—যাঁহার ছয় কোটি সন্তান—তাঁহার
 ভাবনা কি ?

দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—সেই
 অনন্ত কাল-সমুদ্রে সেই প্রতিমা ডুবিল ! অন্ধ-
 কারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল, জল-
 কল্লোলে বিশ্বসংসার পূরিল ! তখন যুক্ত করে,
 সজ্জল নয়নে, ডাকিতে লাগিলাম, উঠ মা হির-
 গুয়ি বঙ্গভূমি ! উঠ মা ! এবার সুসন্তান হইব,
 সংপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব । উঠ মা,

দেবি দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—
 ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম,
 আলস্য ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা—
 একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু
 গেল মা ! উঠ উঠ, উঠ মা বঙ্গজননি !

মা উঠিলেন না । উঠিবেন না কি ?

এস, ভাই সকল ! আমরা এই অন্ধকার
 কালস্রোতে ঝাঁপ দিই । এস, আমরা দ্বাদশ
 কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি
 মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি । এস, অন্ধকারে ভয়
 কি ? ঐ যে নক্ষত্র সকল মধ্য মধ্য উঠিতেছে,
 নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে—চল ! চল !
 অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কাল সমুদ্রে তাড়িত,
 মথিত, ব্যস্ত করিয়া, আমরা সন্তরণ করি—সেই
 স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি । ভয় কি ?
 না হয় ডুবিব ; মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি ?
 আইস, প্রতিমা তুলিয়া আনি, বড় পূজার ধম
 বাঁধিবে । ঘেষক ছাগকে হাড়িকাটে ফেলিয়া
 সৎকীর্তি খড়্গে মায়ের কাছে বলি দিব—কত
 পুরাত্তকার ঢাকী, ঢাক ঘাড়ে করিয়া, বঙ্গের

বাজনা বাজাইয়া আকাশ ফাটাইবে—কত
 ঢোল, কঁাসি, কাড়া, নাগরায় বঙ্গের জয় বাদিত
 হইবে । কত মানাই পোঁ ধরিয়া গাইবে “কত
 নাচ গো ।—” বড় পূজার ধুম বাঁধিবে । কত
 ব্রাহ্মণপণ্ডিত লুচি মণ্ডার লোভে বঙ্গপূজায়
 আসিয়া পাতড়া মারিবে—কত দেশী বিদেশী
 ভদ্রাভদ্র আসিয়া মায়ের চরণে প্রণামি দিবে—
 কত দীন দুঃখী প্রসাদ খাইয়া উদর পূরিবে ।
 কত নর্তকী নাচিবে, কত গায়কে মঙ্গল গায়িবে,
 কত কোটি ভক্তে ডাকিবে মা ! মা ! মা !—

জয় জয় জয় জয়া জয়দাত্রি ।
 জয় জয় জয় বঙ্গ জগদ্ধাত্রি ॥
 জয় জয় জয় সুখদে অন্নদে ।
 জয় জয় জয় বরদে শশ্বদে ॥
 জয় জয় জয় শুভে শুভঙ্করি ।
 জয় জয় জয় শান্তি ফেমঙ্করি ॥
 দ্বেষকদলনি, সন্তানপালিনি ।
 জয় জয় দুর্গে দুর্গতিনাশিনি ॥
 জয় জয় লক্ষ্মি বারীন্দ্রবালিকে ।
 জয় জয় কমলাকান্তপালিকে ॥
 জয় জয় ভক্তিশক্তিদায়িকে ।
 পাপতাপভয়শোকনাশিকে ॥

মৃদুল গস্তীর ধীর ভাষিকে ।
জয় মা কালি করালি অশ্বিকে ॥
জয় হিমালয় নগবালিকে ।
অতুলিত পূর্ণচন্দ্র ভালিকে ॥
শুভে শোভনে সর্কার্থসাধিকে ।
জয় জয় শান্তি শক্তি কালিকে ।
জয় মা কমলাকান্তপালিকে ॥
নমোস্তু তে দেবি বরপ্রদে শুভে ।
নমোস্তু তে কামচরে সদা ক্রবে ॥
ব্রহ্মাণীন্দ্রাণি রুদ্রাণি ভূতভব্যে যশস্বিনি ।
ত্রাহি মাং সর্ষহুঃখেভ্যো দানবানাং ভয়ঙ্করি ॥
নমোস্তু তে জগন্নাথে জনার্দিনি নমোস্তু তে ।
প্রিয়দাস্তে জগন্মাতঃ শৈলপুত্রি বসুন্ধরে ॥
ত্রায়স্ব মাং বিশালাক্ষি ভক্তানাং মার্ভনাশিনি ।
সমামি শিরসা দেবীং বন্ধনোস্তুবিমোচিতঃ ॥*

ছাদশ সংখ্যা ।

একটি গীত ।

“শোন্ প্রসন্ন, তোকে একটি গীত শুনা-
ইব ।”

প্রসন্ন গোয়ালিনী বলিল, “আমার এখন
গান শুনিবার সময় নয়—দুধ যোগাবার বেলা
হলো ।”

কমলাকান্ত । “এসো এসো বঁধু এসো ।’
প্রসন্ন । “ছি ছি ছি ! আমি কি তোমার
বঁধু ?”

কমলাকান্ত । “বালাই ! ষাট, তুমি কেন
বধু হইতে যাইবে ? আমার গীতে আছে”—

এসো এসো বঁধু এসো আধ অঁচরে বসো—

সুর করিয়া আমি কীর্তন ধরাতে প্রসন্ন
দুধের কেঁড়ে রাখিয়া বসিল, আমি গীতটি
আদ্যোপান্ত গায়িলাম ।

“এসো এসো, বঁধু এসো, আধ অঁ চরে বসো,
নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি ।

অনেক দিবসে, মনের মানসে,
তোমা ধনে মিলাইল বিধি ।

মণি নও মাণিক নও যে হার ক'রে গলে পরি,
ফুল নও যে কেশের করি বেশ ।

নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ ॥

বঁধু তোমায় যখন পড়ে মনে,
আমি চাই বৃন্দাবন পানে,
আলুইলে কেশ নাহি বাধি ।

রক্তনশালাতে ঘাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই,
ধূঁয়ার ছলনা করি কাঁদি ।”

মিল ত চমৎকার, “দেখি” আর “বিধি”
মিলিল ! কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায়, এইরূপ মোহ-
মন্ত্র আর একটি শুনিব, মনে বড় সাধ রহি-
য়াছে । যখন এই গান প্রথম কর্ণ ভরিয়া
শুনিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল, নীলাকাশতলে
ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া এই গীত গাই—মনে হইয়া-
ছিল, সেই বিচিত্র সৃষ্টিকুশলী কবির সৃষ্টি দৈব-
বংশী লইয়া, মেঘের উপর যে বায়ুস্তর—শব্দ-
শূন্য, দৃশ্যশূন্য, পৃথিবী যেখান হইতে দেখা যায়

না, সেইখানে বসিয়া, সেই মুরলীতে, একা এই গীত গাই—এই গীত কখন ভুলিতে পারিলাম না ; কখন ভুলিতে পারিব না ।

“এসো এসো বঁধু এসো—”

লোকের মনে কি আছে বলিতে পারি না, কিন্তু আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী, বুঝিতে পারি না যে, ইন্দ্রিয়-পরিভূষ্টিতে কিছু সুখ আছে । যে পশু ইন্দ্রিয় পরিভূষ্টি জন্য পরসন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষী, সে যেন কখন কমলাকান্ত শর্ম্মার দপ্তর-মুক্তাবলী পড়িতে বসে না । আমি বিলাস-প্রিয়ের মুখে “এসো এসো বঁধু এসো” বুঝিতে পারি না । কিন্তু ইহা বুঝিতে পারি যে, মনুষ্য মনুষ্যের জন্য হইয়াছিল—এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের জন্য হইয়াছিল—সেই হৃদয়ে হৃদয়ে সংঘাত, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন, ইহা মনুষ্য-জীবনের সুখ । ইহা হৃদয়ে একমাত্র তৃষা, অন্য হৃদয়কামনা । মনুষ্য-হৃদয় অনবরত হৃদয়ান্তরকে ডাকিতেছে, “এসো এসো বঁধু এসো ।” ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রযুক্তি সকল শরীর রক্ষার্থ—মহতী প্রযুক্তি সকলের উদ্দেশ্য, “এসো এসো বঁধু এসো ।”

তুমি চাকরি কর, খাইবার জন্য—কিন্তু যশের
 আকাঙ্ক্ষা কর, পরের অনুরাগ লাভ করিবার
 জন্য—জনসমাজের হৃদয়কে তোমার হৃদয়ের
 সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য । তুমি যে পরোপ-
 কার কর, সে পরের হৃদয়ের ক্লেশ আপন হৃদয়ে
 অনুভূত কর বলিয়া । তুমি যে রাগ কর, সে
 তোমার মনোমত কার্য হইল না বলিয়া ; হৃদয়
 হৃদয়ে আসিল না বলিয়া । সর্বত্র এই রব—
 “এসো এসো বঁধু এসো ।” সর্ব কর্মের এই
 মন্ত্র, “এসো এসো বঁধু এসো ।” জড় জগতের
 নিয়ম আকর্ষণ । বৃহৎ গ্রহ, উপগ্রহকে ডাকি-
 তেছে, “এসো এসো বঁধু এসো ।” সৌর পিণ্ড
 বৃহৎ গ্রহকে ডাকিতেছে,—“এসো এসো বঁধু
 এসো ।” জগৎ জগদন্তরকে ডাকিতেছে, “এসো
 এসো বঁধু এসো ।” পরমাণু পরমাণুকে অবিরত
 ডাকিতেছে,—“এসো এসো বঁধু এসো ।” জড়-
 পিণ্ড সকল, গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু—সকলেই
 এই মোহমন্ত্র বাঁধা পড়িয়া ঘুরিতেছে । প্রকৃতি
 পুরুষকে ডাকিতেছে, “এসো এসো বঁধু এসো ।”
 জগতের এই গভীর অবিশ্রান্তধ্বনি—“এসো

এসো বঁধু এসো ।” কমলাকান্তের বঁধু কি আসিবে ?

“আধ অঁচরে বসো ।”

এই তৃণশষ্পসমাচ্ছন্ন, কণ্টকাদিতে কর্কশ সংসারারণ্যে, হে বাঞ্ছিত ! তোমাকে আর কি আসন দিব, আমার এই হৃদয়াবরণের অর্ধেক উপবেশন কর । তোমার দুঃখ, তোমার কুশ-কণ্টকাদি আচ্ছাদন জন্য আমি এই আপন অঙ্গ অনাবৃত করিতেছি—আমার অঁচরে বসো । যাহাতে আমার লজ্জারক্ষা, মানরক্ষা, যাহাতে আমার শোভা, হে মিলিত ! তুমিও তাহার অর্ধেক গ্রহণ কর—আধ অঁচরে বসো । হে পরের হৃদয়, হে সুন্দর, হে মনোরঞ্জন, হে সুখদ ! কাছে এসো, আমাকে স্পর্শ কর, আমি তোমাতে সংলগ্ন হইব,—দূরে আসনগ্রহণ করিও না—এই আমার শরীরলগ্ন অঞ্চলার্ধে বসো । হে কমলা-কান্ত ! হে দুর্বিনীত ! হে আজন্মবিবাহশূন্য, তুমি এতদর্থে শান্তিপূরে কঙ্কাদার অঁচলের আধখানা বুঝিও না । তুমি যে অঞ্চলার্ধে বসিবে, তাহার তাঁতি আজিও জন্মে নাই । মনের নগ্নত্ব জ্ঞান-

বস্ত্রে আবৃত ; অর্ধেকে তোমার হৃদয় আবৃত রাখ,
অর্ধেকে বাঞ্ছিতকে বসাত। তুমি মূর্খ—তথাপি
তোমার অপেক্ষা মূর্খ যদি কেহ থাকে, তাহাকে
ডাক—“এসো এসো বঁধু এসো—আধ আঁচরে
বসো।”

“নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।”

কেহ কখন দেখিয়াছে ? তুমি অনেক ধন
উপার্জন করিয়াছ—কখন নয়ন ভরিয়া আত্ম-
ধন দেখিতে পাইয়াছ ? তুমি যশস্বী হইবার
জন্য প্রাণপাত করিয়াছ—কিন্তু আত্মযশোরামি
দেখিয়া কবে তোমার নয়ন ভরিয়াছে ? রূপ-
ভ্রমায় তুমি ইহজীবন অতিবাহিত করিলে—
যেখানে ফুলটি ফুটে, ফলটি দোলে; যেখানে
পাখীটি উড়ে, যেখানে মেঘ ছুটে, গিরিশৃঙ্গ উঠে,
নদী বহে, জল ঝরে, তুমি সেইখানে রূপের
অনুসন্ধানে ফিরিয়াছ—যেখানে বালক, প্রফুল্ল-
মুখমণ্ডল আন্দোলিত করিয়া হাসে, যেখানে
যুবতী ব্রীড়াভরে ভাস্সা ভাস্সা হইয়া শঙ্কিত-
গমনে যায়, যেখানে প্রৌঢ়া নিতান্ত ক্ষুণ্ণ

মধ্যাহ্ন পান্নিনীবৎ অকাতরে রূপের বিকাশ করে, তুমি সেইখানেই রূপের সন্ধানে ফিরিয়াছ, কখন নয়ন ভরিয়া রূপ দেখিয়াছ ? দেখ নাই কি যে, কুমুম দেখিতে দেখিতে শুকায়, ফল দেখিতে দেখিতে পাকে, পড়ে, পচে, গলে ; পাখী উড়িয়া যায়, মেঘ চলিয়া যায়, গিরি ধূমে লুকায়, নদী শুকায়, চাঁদ ডুবে, নক্ষত্র নিবিয়া যায় । শিশুর হাসি রোগে হরণ করে, যুবতীর ব্রীড়া—কিসে না যায় ? প্রৌঢ়া বয়সে শুকাইয়া যায় । ইহা সংসারের দুর্দৃষ্ট—কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না । অথবা এই সংসারের শুভা-দৃষ্ট—কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না । গতিই সংসারের সুখ—চাঞ্চল্যই সংসারের সৌন্দর্য্য । নয়ন ভরে না । সে নয়ন আমরা পাই নাই । পাইলে সংসার দুঃখময় হইত ; পরিতৃপ্তি রাক্ষসী আমাদের সকল সুখকে গ্রাস করিত । যে কারিগর এই পরিবর্তনশীল সংসার, আর এই অতৃপ্য নয়ন সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার কারিগরির উপর কারিগরি, এই বাসনা, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি । জগৎ পরিবর্তনশীল,

নয়নও অতৃপ্য, অথচ বাসনা—নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি ।

হে রূপ ! হে বাহু সৌন্দর্য্য ! হে অন্তঃ-
প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট ! কাছে আইস,
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি । দূরে বসিলে দেখা
হইবে না ; কেন না, দেখা কেবল নয়নে নহে ।
সংস্পর্শ বা নৈকট্য ব্যতীত মনের বৈদ্যুতী বহে
না—আমরা সর্ব শরীরে দেখিয়া থাকি । মনে
হইতে মনে বৈদ্যুতী চলিলে তবে নয়ন ভরিবে ।
হায় ! কিসেই বা নয়ন ভরিবে ! নয়নে যে পলক
আছে !

“অনেক দিবসে, মনের মানসে
তোমা ধনে মিলাইল বিধি হে !”

আমি কখন কখন মনে করিয়া থাকি, কেবল
দুঃখের পরিমাণ জনাই দয়া করিয়া বিধাতা দিব-
সের সৃষ্টি করিয়াছিলেন । নহিলে কাল অপরি-
মেয়, মনুষ্য-দুঃখ অপরিমিত হইত । আমরা
এখন বলিতে পারি যে, আমি দুই দিন, দুই মাস,
বা দুই বৎসর দুঃখভোগ করিতেছি ; কিন্তু দিন
রাত্রির পরিবর্তন না থাকিলে, কালের পথ চিহ্ন-

শূন্য হইলে, কে না বুদ্ধিত যে, আমি অনন্ত কাল
 দুঃখভোগ করিতেছি ? আশা তাহা হইলে দাঁড়া-
 ইবার স্থান পাইত না—এত দিন পরে আবার
 দুঃখান্ত হইবে, এ কথা কেহ ভাবিতে পারিত
 না—বৃক্ষাদিশূন্য অনন্ত প্রান্তরবৎ জীবনের পথ
 অনুত্তীর্ণ্য হইত—জীবনযাত্রা দুর্কিসহ যন্ত্রণা-
 স্বরূপ হইত । অতএব এই বৃহৎ জগৎকেন্দ্রে সূর্যোর
 পথ আমাদের সুখ দুঃখের মানদণ্ড । দিবসগণ-
 নায় সুখ আছে । সুখ আছে বলিয়াই দুঃখী জন
 দিবস গণিয়া থাকে । দিবস গণনা দুঃখবিনোদন ।
 কিন্তু এমন দুঃখীও আছে যে, সে দিবস গণে না ;
 দিবস-গণনা তাহার পক্ষে চিত্তবিনোদন নহে ।
 আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী—পৃথিবীতে ভুলিয়া
 মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়াছি—সুখহীন, আশাহীন,
 উদ্দেশ্যশূন্য, আকাঙ্ক্ষাশূন্য আমি কি জন্য দিবস
 গণিব ? এই সংসারসমুদ্রে আমি ভাসমান তৃণ,
 সংসার-বাত্যায় আমি ঘূর্ণ্যমান ধূলিকণা, সংসারা-
 রণ্যে আমি অফলৎ বৃক্ষ—সংসারাকাশে আমি
 বারিশূন্য মেঘ—আমি কেন দিবস গণিব ?

গণিব । আমার এক দুঃখ, এক সন্তাপ, এক

ভরসা আছে। ১২০৩ শাল হইতে দিবস গণি।
 যে দিন বঙ্গে হিন্দু নাম লোপ পাইয়াছে, সেই
 দিন হইতে দিন গণি। যে দিন সপ্তদশ অশ্বা-
 রোহী বঙ্গজয় করিয়াছিল, সেই দিন হইতে
 দিন গণি। হায়! কত গণিব! দিন গণিতে
 গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর
 হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও
 ফিরিয়া ফিরিয়া সাত বার গণি। কই, অনেক
 দিবসে মনের মানসে বিধি মিলাইল, কই? যাহা
 চাই, তাহা মিলাইল কই? মনুষ্যত্ব মিলিল কই?
 একজাতীয়ত্ব মিলিল কই? ঐক্য কই? বিদ্যা
 কই? গৌরব কই? শ্রীহর্ষ কই? ভট্টনারায়ণ
 কই? হলায়ুধ কই? লক্ষ্মণসেন কই? আর কি
 মিলিবে না? হায়! সবারই ইপ্সিত মিলে,
 কমলাকান্তের মিলিবে না?

“মণি নও মানিক নও, যে হার করে গলে পরি—”

বিধাতা জগৎ জড়ময় করিয়াছেন কেন?
 রূপ জড়পদার্থ কেন? সকলই অশরীরী হইল
 না কেন? হইলে হৃদয় হৃদয়ে কেমন মিলিত!
 যদি রূপের শরীরে প্রয়োজন ছিল, তবে তোমার

আমার বিধাতা এক শরীর করেন নাই কেন ? তাহা হইলে আর ত বিচ্ছেদ হইত না। এখন কি এক শরীর হয় না ? আমার শরীরে এত স্থান আছে—তোমাকে তাহাতে কোথাও কি রাখিতে পারি না ? তোমাকে কণ্ঠলগ্ন করিয়া হৃদয়ে বিলম্বিত করিয়া রাখিতে পারি না ? হায় ! তুমি মণি নও, মাণিক নও যে, হার করিয়া গলে পরি।

আর বঙ্গভূমি ! তুমিই বা কেন মণি মাণিকা হইলে না, তোমায় কেন আমি হার করিয়া, কণ্ঠে পরিতে পাইলাম না ! তোমায় যদি কণ্ঠে পরিতাম, মুসলমান আমার হৃদয়ে পদাঘাত না করিলে তাহার পদরেণু তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। তোমায় সুবর্ণের আসনে বসাইয়া, হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম। ইউরোপে, আমেরিকে, মিসরে, চীনে, দেখিত, তুমি আমার কি উজ্জ্বল মণি !

“আমায় নারী না করিত বিধি

তোমা হেন গুণনিধি

লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ !”

প্রথমে আস্থান, “এসো এসো বঁধু এনো”
পরে আদর, “আধ আঁচরে বসো” পরে ভোগ
“নয়ন ভারিয়া তোমায় দেখি ।” তখন সুখ-
ভোগকালীন পূৰ্বদুঃখস্মৃতি—“অনেক দিবসে,
মনের মানসে, তোমা ধনে মিলাইল বিধি ।”
সুখ দ্বিবিধ, সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ । অসম্পূর্ণ
সুখ যথা,

“মণি নও মাণিক নও, যে হার করে গলে পরি ।”
পরে সম্পূর্ণ সুখ,

“আমায় নারী না করিত বিধি,
তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ ।”

সম্পূর্ণ, অসহ্য সুখের লক্ষণ, শারীরিক
চাকলা, মানসিক অশৈর্ষ্য । এ সুখ কোথায় রাখিব,
লইয়া কি করিব, আমি কোথায় যাইব, এ সুখের
ভার লইয়া কোথায় ফেলিব ? এ সুখের ভার
লইয়া আমি দেশে দেশে ফিরিব ; এ সুখ
এক স্থানে ধরে না ; যেখানে যেখানে পৃথিবীতে
স্থান আছে, সেইখানে সেইখানে এ সুখ লইয়া
যাইব, এ জগৎ সংসার এই সুখে পুরাইব ।

সংসার এ সুখের সাগরে ভাসাইব ; মেরু হইতে মেরু পর্য্যন্ত সুখের তরঙ্গ নাচাইব, আপনি ডুবিয়া, উঠিয়া, ভাসিয়া, হেলিয়া, ছুটিয়া বেড়াইব। এ সুখে কমলাকান্তের অধিকার নাই—এ সুখে বাঙ্গালির অধিকার নাই। সুখের কথাতেই বাঙ্গালির অধিকার নাই। গোপীর দুঃখ, বিধাতা গোপীকে নারী করিয়াছেন কেন—আমাদের দুঃখ, বিধাতা আমাদের নারী করেন নাই কেন—তাহা হইলে এ মুখ, দেখাইতে হইত না।

সুখের কথায় বাঙ্গালির অধিকার নাই—কিন্তু দুঃখের কথায় আছে। কাতরোক্তি যত গভীর, যতই হৃদয়বিদারক হউক না কেন, তাহা বাঙ্গালির মর্শ্মোক্তি।—আর কাতরোক্তি কোথায় বা নাই? নবপ্রসূত পক্ষিশাবক হইতে মহাদেবের শৃঙ্গধ্বনি পর্য্যন্ত সকলই কাতরোক্তি। অসম্পূর্ণসুখে সুখীও সুখকালে পূর্বদুঃখ স্মরণ করিয়া কাতরোক্তি করে। নহিলে সুখের সম্পূর্ণতা কি? দুঃখস্মৃতি ব্যতীত সুখের সম্পূর্ণতা কোথায়? সুখও দুঃখময়—

“তোমার বধন পড়ে মনে,
আমি চাই বৃন্দাবন পানে,
আলুইলে কেশ নাহি বাধি।”

এই কথা সুখ দুঃখের সীমা রেখা। যাহার নষ্ট সুখের স্মৃতি জাগরিত হইলে সুখের নিদর্শন এখনও দেখিতে পায়, সে এখনও সুখী— তাহার সুখ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। তাহার বন্ধু, তাহার প্রিয়, বাঞ্ছিত—গিয়াছে, কিন্তু তাহার বৃন্দাবন আছে—মনে করিলে, সে সেই সুখভূমি পানে চাহিতে পারে। যাহার সুখ গিয়াছে—সুখের নিদর্শন গিয়াছে—বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে, এখন আর চাহিবার স্থান নাই—সেই দুঃখী, অনন্ত দুঃখে দুঃখী। বিধবা যুবতী, মৃত পতির যত্নরক্ষিত পাছুকা হারাইলে, যেমন দুঃখে দুঃখী হয়, তেমনই দুঃখে দুঃখী।

আমার এই বঙ্গদেশের সুখের স্মৃতি আছে—নিদর্শন কই? দেবপালদেব, লক্ষ্মণসেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ,—প্রয়াগ পর্য্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম, গোড়ী রীতি, এ সকলের স্মৃতি আছে, কিন্তু নিদর্শন কই? সুখ মনে

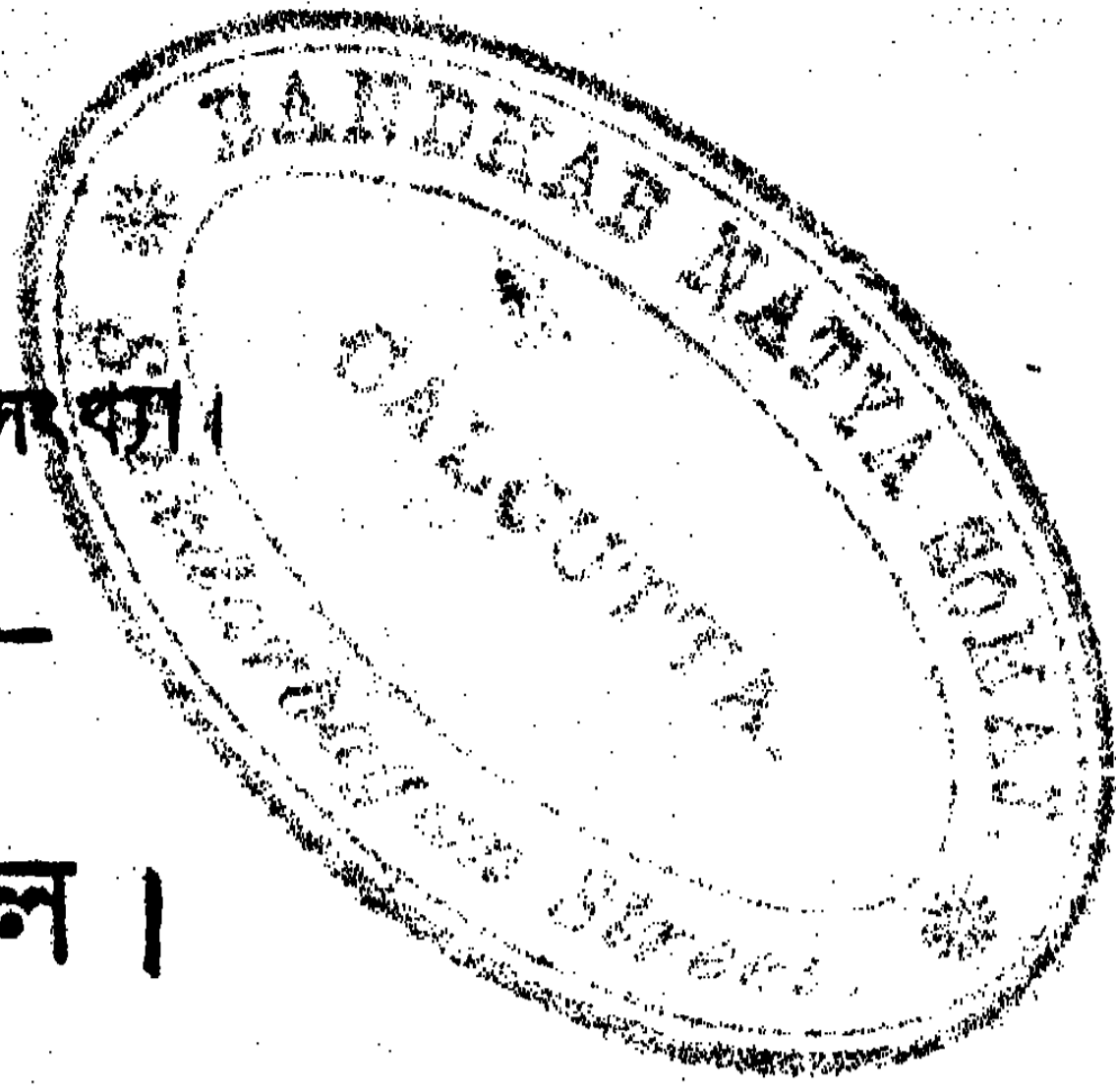
পড়িল, কিন্তু চাহিব কোন্ দিকে ? সে গোড়
কই ? সে যে কেবল যবনলাঞ্ছিত ভগ্নাবশেষ !
আর্য্য রাজধানীর চিহ্ন কই ? আর্য্যের ইতিহাস
কই ? জীবনচরিত কই ? কীর্ত্তি কই ? কীর্ত্তি-
স্তম্ভ কই ? সমরক্ষেত্র কই ? সুখ গিয়াছে—
সুখ-চিহ্নও গিয়াছে, বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও
গিয়াছে—চাহিব কোন্ দিকে ?

চাহিবার এক শ্মশান-ভূমি আছে,—নব-
দ্বীপ । সেইখানে সপ্তদশ যবনে বাঙ্গালা জয়
করিয়াছিল । বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে, আমি
সেই শ্মশান-ভূমি প্রতি চাই । যখন দেখি,
সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্ৰাম বেড়িয়া অদ্যাপি সেই কল-
ধৌতবাহিনী গঙ্গা তর তর রব করিতেছেন.
তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—ভূমি
আছ, সে রাজলক্ষ্মী কোথায় ? তুমি যাহার পা
ধুয়াইতে, সেই মাতা কোথায় ? তুমি যাহাকে
বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে, সেই আনন্দরূপিণী
কোথায় ? তুমি যাঁহার জন্য সিংহল, বালী,
আরব, সুমিত্রা হইতে বুকে করিয়া ধন বহন
করিয়া আনিতে, সে ধনেশ্বরী কোথায় ? তুমি

যাঁহার রূপের ছায়া ধরিয়া রূপসী সাজিতে,
 সে অনন্তসৌন্দর্যশালিনী কোথায় ? তুমি যাহার
 প্রসাদি ফুল লইয়া ঐ স্বচ্ছ হৃদয়ে মালা
 পরিতে, সে পুষ্পাভরণা কোথায় ? সে রূপ,
 সে ঐশ্বর্য কোথায় ধুইয়া লইয়া গিয়াছ ? বিশ্বাস-
 ঘাতিনি, তুমি কেন আবার শ্রবণমধুর কল
 কল তর তর রবে মন ভুলাইতেছ ? বুঝি তোমা-
 রই অতল গর্ভমধ্যে, যবনভয়ে ভীতা সেই লক্ষ্মী
 ডুবিয়াছেন, বুঝি কুপুল্লগণের আর মুখ দেখি-
 বেন না বলিয়া ডুবিয়া আছেন। মনে মনে
 আমি সেই দিন কল্পনা করিয়া কাঁদি। মনে
 মনে দেখিতে পাই, মার্জিত বর্ষাকলক উন্নত
 করিয়া, অশ্বপদশব্দমাত্রে নৈশ নীরব বিদ্রিত
 করিয়া, যবনসেনা নবদ্বীপে আসিতেছে।
 কালপূর্ণ দেখিয়া নবদ্বীপ হইতে বাঙ্গালার লক্ষ্মী
 অন্তর্হিতা হইতেছেন। সহসা আকাশ অন্ধকারে
 ব্যাপিল ; রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে
 লাগিল। পথিক ভীত হইয়া পথ ছাড়িল ;
 নাগরীর অলঙ্কার খসিয়া পড়িল ; কুঞ্জবনে
 পক্ষিগণ নীরব হইল ; গৃহময়ূরকণ্ঠে অর্ধব্যক্ত

কেকার অপরাধ আর ফুটিল না। দিবসে নিশীথ উপস্থিত হইল, পণ্যবীথিকার দীপমালা নিবিয়া গেল, পূজাগৃহে বাজাইবার সময়ে শঙ্খ বাজিল না; পণ্ডিতে অশুদ্ধ মন্ত্র পড়িল; সিংহাসন হইতে শালগ্রামশিলা গড়াইয়া পড়িল। যুবার সহসা বলক্ষয় হইল; যুবতী সহসা বৈধব্য আশঙ্কা করিয়া কাঁদিল; শিশু বিনারোগে মাতার ক্রোড়ে শুইয়া মরিল। গাঢ়তর, গাঢ়তর, গাঢ়তর অন্ধকারে দিক্ ব্যাপিল; আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী, রাজবস্ত্র, দেবমন্দির, পণ্যবীথিকা, সেই অন্ধকারে ঢাকিল—কুঞ্জতীরভূমি, নদী, নদীসৈকত, নদীতরঙ্গ সেই অন্ধকারে—অঁধার, অঁধার, অঁধার হইয়া লুকাইল। আমি চক্ষে সব দেখিতেছি—আকাশ মেঘে ঢাকিতেছে—ঐ সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রাজলক্ষ্মী জলে নামিতেছেন। অন্ধকারে নির্বাণোন্মুখ আলোকবিন্দুবৎ, জলে, ক্রমে ক্রমে সেই তেজোরশি বিলীন হইতেছে। যদি গঙ্গার অতল-জলে না ডুবিলেন, তবে আমার সেই দেশলক্ষ্মী কোথায় গেলেন?

ত্রয়োদশ সংখ্যা।



বিড়াল।

আমি শয়নগৃহে, চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুক্কা হাতে, ঝিমাইতেছিলাম। একটু মিট্ মিট্ করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে—দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহা! প্রস্তুত হয় নাই—এজন্য হুক্কা হাতে, নিম্নীলিত-লোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন্ হইতাম, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কি না। এমত সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল, “মেও!”

চাহিয়া দেখিলাম—হঠাৎ কিছু বুদ্ধিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিস ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে, পাষণ্ডবৎ কঠিন হইয়া, বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্বে যথোচিত পুরস্কার

দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভাল নহে। ডিউক বলিল, “মেও!”

তখন চক্ষু চাহিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম, যে ওয়েলিংটন নহে। একটি ক্ষুদ্র মার্জ্জার; প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে; আমি তখন ওয়াটালুর মাঠে ব্যহ-রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই। এক্ষণে মার্জ্জার সুন্দরী, নির্জল দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এক্ষণে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে, অতি মধুর স্বরে বলিতেছিলেন, “মেও!” বলিতে পারি না, বুঝি, তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল; বুঝি, মার্জ্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, “কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।” বুঝি সে “মেও!” শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় ছিল। বুঝি বিড়ালের মনের ভাব, “তোমার দুগ্ধ ত খাইয়া বাসিয়া আছি— এখন বল কি?”

বলি কি? আমি ত ঠিক করিতে পারিলাম

না । দুধ আমার বাপেরও নয় । দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন । অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই ; সুতরাং রাগ করিতে পারি না । তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, বিড়ালে দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয় । আমি যে সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকূলে কুলাঙ্গার স্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে । কি জানি, এই মার্জ্জারী যদি স্বজাতিমণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে ? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয় । ইহা স্থির করিয়া, সকাতিরচিত্তে, হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া, অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্বে মার্জ্জারী প্রতি ধাবমান হইলাম ।

মার্জ্জারী কমলাকান্তকে চিনিত ; সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না । কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া, একটু সরিয়া বসিল । বলিল, “মেও !” প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া, হুঁকা লইলাম । তখন

দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, মার্জারের বক্তব্য সকল বুঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম যে, বিড়াল বলিতেছে, “মার্ পিট কেন ? স্থির হইয়া, ছঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি ? এ সংসারের ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস, সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন ? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কি ? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে—আমাদের কি নাই ? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই ; কিন্তু আমরা খাইলেই তোমরা কোন্ শাস্ত্রানুসারে ঠেস্কা লাঠি লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয় সকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এত দিনে এ কথাটি বুঝিতে পারিয়াছ।

“দেখ, শযাশায়ী মনুষ্য ! ধর্ম কি ? পরো-পকারই পরম ধর্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া

আমার পরম উপকার হইয়াছে । তোমার আহ-
রিত দুখে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল—অতএব
তুমি সেই পরম ধর্মের ফলভাগী ।—আমি চুরিই
করি, আর যাই করি, আমি তোমার ধর্মসঙ্কয়ের
মূলীভূত কারণ । অতএব আমাকে প্রহার না
করিয়া, আমার প্রশংসা কর । আমি তোমার
ধর্মের সহায় !

“দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ
করিয়া চোর হইয়াছি ? খাইতে পাইলে কে
চোর হয় ? দেখ, ষাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের
নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোরের
অপেক্ষাও অধার্মিক । তাঁহাদের চুরি করিবার
প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না । কিন্তু
তাঁহাদের প্রয়োজনাতির ধন থাকিতেও চোরের
প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে
চুরি করে । অধর্ম চোরের নহে—চোরে যে চুরি
করে, সে অধর্ম কৃপণ ধনী । চোর দোষী বটে,
কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী ।
চোরের দণ্ড হয় ; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার
দণ্ড হয় না কেন ?

“দেখ, আমি প্রাচীরে প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটা-খানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত, নরদামায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষধা কি প্রকারে জানিবে! হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মত দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখন অন্ধকে যুষ্টি-ভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না—সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোটলোকের দুঃখে কাতর! ছি! কে হইবে?”

“দেখ, যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়ালঙ্কার, আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং যোড় হাত করিয়া বলিতে, আর একটু কি আনিয়া দিব? তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাহার

অতি পণ্ডিত, বড় মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশী? তা ত নয়—তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ—দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর—আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর—ছি! ছি!

“দেখ, আমাদের দশা দেখ, দেখ প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, প্রাসাদে প্রাসাদে, মেও মেও করিয়া আমরা চারি দিক্ দৃষ্টি করিতেছি—কেহ আমাদের মাছের কাঁটাখানা ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ আমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল—গৃহমার্জ্জার হইয়া, বৃদ্ধের নিকট যুবতী ভার্য্যার সহোদর, বা মূৰ্খ ধনীরা কাছে সতরঞ্চ খেলওয়ার স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল—তবেই তাহার পুষ্টি। তাহার লেজ ফুলে, গায়ে লোম হয়, এবং তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়া, অনেক মার্জ্জার কবি হইয়া পড়ে।

“আর আমাদের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর ক্লশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাল্লু ল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে—জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে—অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, “মেও ! মেও ! খাইতে পাই না !—” আমাদের কাল চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না ! এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব।’ আমাদের কৃষ্ণ চর্ম্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ স্কন্ধ মেও মেও শুনিয়া তোমাদের কি দুঃখ হয় না ? চোরের দণ্ড আছে, নির্দয়তার কি দণ্ড নাই ? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন ? তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী, কেন না আফিস্‌খোর, তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোষেই দরিদ্রে চোর হয় ? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া এক জনে পাঁচ শত লোকের আহাৰ্য্য সংগ্রহ করিবে কেন ? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন ? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার

নিকট হইতে চুরি করিবে ; কেন না অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।”

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, “থাম ! থাম মার্জ্জারপণ্ডিতে ! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিষ্টিক ! সমাজ বিশৃঙ্খলার মূল ! যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।”

মার্জ্জার বলিল, “না হইল ত আমার কি ? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কি ক্ষতি ?”

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, “সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।” বিড়াল রাগ করিয়া বলিল যে, “আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব ?”

বিড়ালকে বুঝান দায় হইল। যে বিচারক

বা নৈয়ায়িক, কস্মিন্ কালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জ্জার সুবিচারক, এবং সুতর্কিক ও বটে, সুতরাং না বুঝিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম, “সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণ্ডবিধান কর্তব্য।”

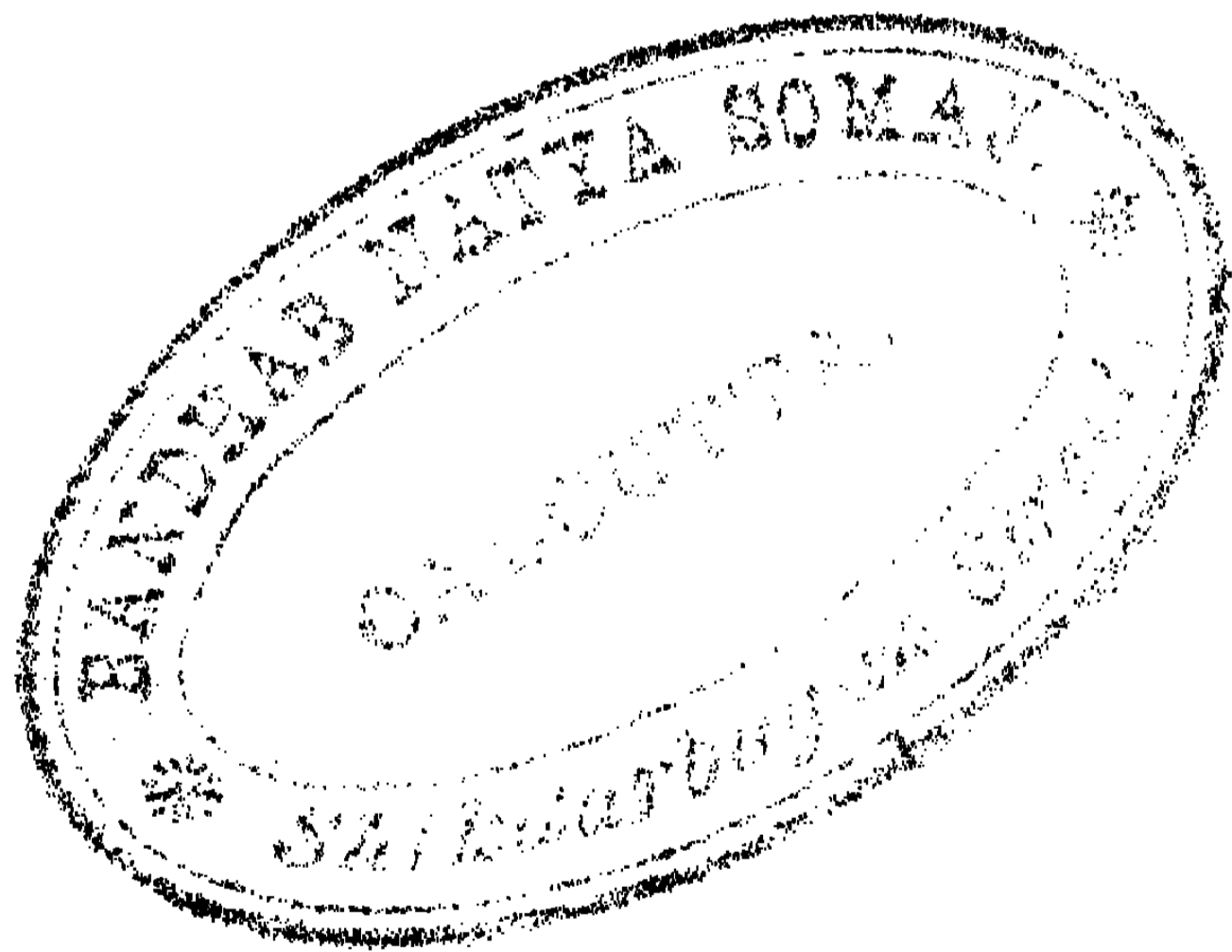
মার্জ্জাবী মহাশয়া বলিলেন, “চোরকে ফাঁসি দেও, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিন দিন উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে নশীবাবুর ভাণ্ডার-ঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপত্তি করিব না।”

বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জ্জারকে বলিলাম যে, “এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাচরণে মন দাও। তুমি যদি চাহ, তবে পাঠার্থে তোমাকে আমি নিউমান ও পার্করের গ্রন্থ দিতে পারি। আর কমলাকান্তের দপ্তর পড়িলেও কিছু উপকার হইতে পারে—আর কিছু হউক বা না হউক, আফিসের অসীম মহিমা বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিকে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিও, উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীরা হও, তবে পুনর্ব্বার আসিও, এক সরিষাভোর আফিস দিব।”

মার্জ্জার বলিল “আফিসে বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা, ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।”

মার্জার বিদায় হইল। একটি পতিত
আত্মাকে অক্ষকার হইতে আলোকে আনিয়াছি,
ভাবিয়া কমলাকান্ত পাদ্রির ষড় আনন্দ হইল!
কমলাকান্ত চক্রবর্তী।

কমলাকান্তের পত্র ।



কমলাকান্তের পত্র ।

প্রথম সংখ্যা ।

১। কি লিখিব ?

পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত বঙ্গদর্শন* সম্পাদক মহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু ।

আমার নাম শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী, সাবেক
নিবাস শ্রীশ্রী নদিধাম, আপনাকে আমি প্রণাম
করি । আপনার নিকট আমার সাক্ষাৎসম্বন্ধে
পরিচয় নাই, কিন্তু আপনি নিজগুণে আমার
বিশেষ পরিচয় লইয়াছেন, দেখিতেছি । ভীষ্ম-
দেব খোশনবীশ, জুয়াচোর লোক আমি পূর্বেই
বুঝিয়াছিলাম—আমি দপ্তরটি তাঁহার নিকট
গচ্ছিত রাখিয়া তীর্থদর্শনে যাত্রা করিয়াছিলাম ;
তিনি সেই অবসর পাইয়া সেইটি আপনাকে
বিক্রয় করিয়াছেন । বিক্রয় কথাটি আপনি
স্বীকার করেন নাই, কিন্তু আমি জানি ভীষ্মদেব

* “কমলাকান্তের দপ্তর” বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হয় ।

ঠাকুর বিনামূল্যে শালগ্রামকে তুলসী দেন না, বিনামূল্যে যে আপনাকে শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী প্রণীত দপ্তর দিবেন, এমত সম্ভাবনা অতি বিরল। এই জুয়াচুরির কথা আমি এত দিন জানিতাম না। দৈবাধীন একটি যোড়া জুতা কিনিয়া এ সন্ধান পাইলাম। একখানি ছাপার কাগজে জুতা যোড়াটি বান্ধা ছিল, দেখিয়া ভাবিতেছিলাম যে, কাহার এমন সৌভাগ্যের উদয় হইল যে, তাহার রচনা শ্রীমৎ কমলাকান্ত শর্ম্মার চরণযুগলের ব্যবহার্য পাছুকাষয় মণ্ডন করিতেছে! মনে করিলাম, সার্থক তাহার লেখনীধারণ! সার্থক তাহার নিশীথতৈলদাহ! মূর্খের দ্বারা তাহার রচনা পঠিত না হইয়া সাধু জনের চরণের সঙ্গে যে কোন প্রকার সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে, ইহা বঙ্গীয় লেখকের সৌভাগ্য। এই ভাবিয়া কোতূহলাবিষ্ট হইয়া পড়িয়া দেখিলাম যে, কাগজখানি কি। পড়িলাম, উপরে লেখা আছে, “বঙ্গদর্শন।” ভিতরে লেখা আছে, “কমলাকান্তের দপ্তর।” তখন বুঝিলাম যে, আমারি এ পূর্বজন্মার্জিত স্মৃতির ফল।

আরও একটু কৌতূহল জন্মিল । বঙ্গদর্শন কি, তাহা জানিবার ইচ্ছা হইল । এক জন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, “মহাশয় বঙ্গদর্শনটা কি, তাহা বলিতে পারেন ?” তিনি অনেক ক্ষণ ভাবিলেন । অনেক ক্ষণ পরে মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিলেন, “বোধ হয় বঙ্গদেশ দর্শন করাই বঙ্গদর্শন ।” আমি তাঁহার পাণ্ডিত্যের অনেক প্রশংসা করিলাম, কিন্তু অগত্যা অন্য বন্ধুকেও ঐ প্রশ্ন করিতে হইল । অন্য বন্ধু সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শকারের উপর যে রেফটি আছে বোধ হয়, তাহা মুদ্রাকরের ভ্রম ; শব্দটি “বঙ্গদর্শন,” অর্থাৎ বাঙ্গালার দাঁত । আমি তাঁহাকে চতুষ্পাঠী খুলিতে পরামর্শ দিয়া অন্য এক সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম । তিনি বঙ্গ শব্দে পূর্ব-বাঙ্গালা ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, “ইহার অর্থ পূর্ব বাঙ্গালা দর্শন করিবার বিধি ; অর্থাৎ ‘A Guide to Eastern Bengal’ এইরূপ বহুপ্রকার অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে জানিতে পারিলাম যে, বঙ্গদর্শন একখানি মাসিক পত্রিকা এবং তাহাতে কমলাকান্ত শর্ম্মার মাসিক পিণ্ডান

হইয়া থাকে। এক্ষণে আবার শুনিতেছি, কোন ধনুর্ধর ঐ দপ্তরগুলি নিজপ্রণীত বলিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। আরও কত হবে?

অতএব হে বঙ্গদর্শন-সম্পাদক মহাশয়! অবগত হউন যে, আমি শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মা সশরীরে ইহজগতে অদ্যাপি অধিষ্ঠান করিতেছি এবং আপনাদিগের বিশেষ আপত্তি থাকিলেও আরও কিছু দিন অধিষ্ঠান করিব এমত ইচ্ছা রাখি।

এক্ষণে কি জন্য আপনাকে অদ্য পত্র লিখিতেছি, তাহা অবগত হউন। উপরে দেখিতে পাইবেন, “শ্রীশ্রী ৬ নসিধাম” লিখিয়াছি। অর্থাৎ আমার নসি বাবু শ্রীশ্রী ৬ঈশ্বরে বিলীন হইয়াছেন! ভরসা করি যে, তিনি সে সর্বশ্রয় শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহার গতি কোন্ পথে হইয়াছে, তাহার নিশ্চিত সম্বাদ আমি রাখি না। কেবল ইহাই জানি যে, ইহলোকে তিনি নাই! অতএব আমারও আর আশ্রয় হান! অহিফেনের কিছু গোলযোগ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কিছু বন্দোবস্ত করিতে পারেন? আমার

দপ্তরের জন্য আপনি খোসনবীশ মহাশয়কে কি দিয়াছিলেন বলিতে পারি না ; কিন্তু আমাকে এক আধ পোয়া আকিঙ্গ পাঠাইলেই (আমার মাত্রা কিছু বেশী) আমি এক একটি প্রবন্ধ পাঠাইতে পারিব । আপনার মঙ্গল হউক ! আপনি ইহাতে দ্বিভক্তি করিবেন না ।

কিন্তু আপনার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত পাকা-পাকি করিবার আগে, গোটা কত কথা জিজ্ঞাসা আছে । এ কমলাকান্তি কলে, ফরমায়েস মত সকল রকমের রচনা প্রস্তুত হয়—আপনার চাই কি ? নাটক নবেল চাই, না পলিটিকের দরকার ? কিছু ঐতিহাসিক গবেষণা পাঠাইব, না সংক্ষিপ্ত সমালোচনার বাহার দিব ? বিজ্ঞানশাস্ত্রে আপ-নার প্রসক্তি, না ভৌগোলিকতত্ত্ব রসে আপনি সুরসিক ? স্কুল কথাটা, গুরু বিষয় পাঠাইব, না লঘু বিষয় পাঠাইব ? আমার রচনার মূল্য, আপনি গজ দরে দিবেন, না মণ দরে দিবেন ? আর যদি গুরু বিষয়েই আপনার অভিরুচি হয়, তবে বলিবেন, তাহার কি প্রকার অলঙ্কারসম্মা-বেশ করিব । আপনি কোটেশ্যান ভাল বাসেন,

না ফুটনোটে আপনার অনুরাগ ? যদি কোটে-
শ্যান বা ফুটনোটের প্রয়োজন হয়, তবে কোন্
ভাষা হইতে দিব, তাহাও লিখিবেন । ইউরোপ
ও আসিয়ার সকল ভাষা হইতেই আমার
কোটেশ্যান সংগ্রহ করা হইয়াছে—আফ্রিকাও
আমেরিকার কতকগুলি ভাষার সন্ধান পাই
নাই । কিন্তু সেই সকল ভাষার কোটেশ্যান,
আমি অচিরাৎ প্রস্তুত করিব, আপনি চিন্তিত
হইবেন না ।

যদি গুরু বিষয়ক রচনা আপনার নিতান্ত
মনোনীত হয়, তবে কি প্রকার গুরু বিষয়ে আপ-
নার আকাঙ্ক্ষা, তাহাও জানাইবেন । আমি স্বয়ং
সে দিকে কিছু করিতে পারি না পারি, আমার
এক বড় সহায় জুটিয়াছে । ভীষ্মদেব খোস-
নবীশ মহাশয়ের পুত্র ষিনি ইউটিলিটি শব্দের
আশ্চর্য ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন*, তাঁহাকে আপ-
নার স্মরণ থাকিতে পারে । তিনি এক্ষণে কৃত-
বিন্দ্য হইয়াছেন । এম, এ, পাস করিয়া বিদ্যার
ফাঁস গলায় দিয়াছেন । গুরু বিষয়ে তাঁহার

* ইউ—টিল—ইটি—আই ।

সম্পূর্ণ অধিকার। ইক্ষুলের বহি চাই কি? তিনি বর্ণপরিচয় হইতে রোমদেশের ইতিহাস পর্যন্ত সকলই লিখিতে পারেন। ন্যাচরল্ হিষ্টোরির একশেষ করিয়া রাখিয়াছেন; পুরাতন পেনিমেগেজিন্ হইতে অনেক প্রবন্ধের অনুবাদ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং গোল্ড স্মিথকৃত এনিমেটেড নেচরের সারাংশ সংকলন করিয়া রাখিয়াছেন। সে সব চাই কি? গুরুর মধ্যে গুরু যে পাটীগণিত এবং জ্যামিতি, তাহাতেও সাহসশূন্য নহেন। জ্যামিতি এবং ত্রিকোণমিতি চুলোয় যাক, চতুষ্কোণমিতিতেও তাঁহার অধিকার—দৈববিদ্যাবলে তিনি আপনার পৈতৃক চতুষ্কোণ পুকুরটিও মাপিয়া ফেলিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, শুনিয়া লোকে ধন্য ধন্য করিয়াছিল। তাঁহার ঐতিহাসিক কীর্তির কথা কি বলিব? তিনি চিতোরের রাজা আলফ্রেড দি গ্রেটের একখানি জীবনচরিত দশ পনের পৃষ্ঠা লিখিয়া রাখিয়াছেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যসমালোচন-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ মহাভারত হইতে সংকলিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে কোমত ও

হ'ব'ট স্পেন্সরের মত খণ্ডন আছে ; এবং ডারু-ইন যে বলেন, (বলেন কি না, তাহা ঈশ্বর জানেন) যে মাধ্যাকর্ষণের বলে পৃথিবী স্থির আছে, তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে মালতী-মাধব হইতে চারি পাঁচটা শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সুতরাং এখানি মোটের উপরে ভারি রকমের গুরু-বিষয়ক গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে। ভরসা করি, সমালোচনাকালে আপনারা বলিবেন, বাঙ্গালা ভাষায় ইহা অদ্বিতীয়।

ভরসা করি, গুরু বিষয় ছাড়িয়া লঘু বিষয়ে আপনাদের অভিরুচি হইবে না। কেন না, সে সকলের কিছু অসুবিধা। খোষনবীশপুত্র একখানি নাটকের সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখিয়াছেন বটে ; নায়িকার নাম চন্দ্রকলা কি শশিরন্তা রাখিবেন স্থির করিয়াছেন,—তাহার পিতা বিজয়পুরের রাজা ভীমসিংহ ; আর নায়ক আর একটা কিছু সিংহঃ এবং শেষ অঙ্কে শশিরন্তা নায়কের বৃকে ছুরি মারিয়া আপনি হা হতোহ্মি করিয়া পুড়িয়া মরিবেন, এই সকল স্থির করিয়াছেন। কিন্তু নাটকের আদ্য ও মধ্য ভাগ কি প্রকার হইবে,

এবং অন্যান্য “নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগণ” কিরূপ করিবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই । শেষ অঙ্কের ছুরি-মারা সিনের কিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন ; এবং আমি শপথ পূর্বক আপনার নিকট বলিতে পারি যে, যে কুড়ি ছত্র লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে আটটা “হা, সখি !” এবং তেরটা “কি হলো ! কি হলো !” সমাবেশ করিয়াছেন । শেষে একটি গীতও দিয়াছেন—নায়িকা ছুরি হস্তে করিয়া গায়িতেছে ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নাটকের অন্যান্য অংশ কিছুই লেখা হয় নাই ।

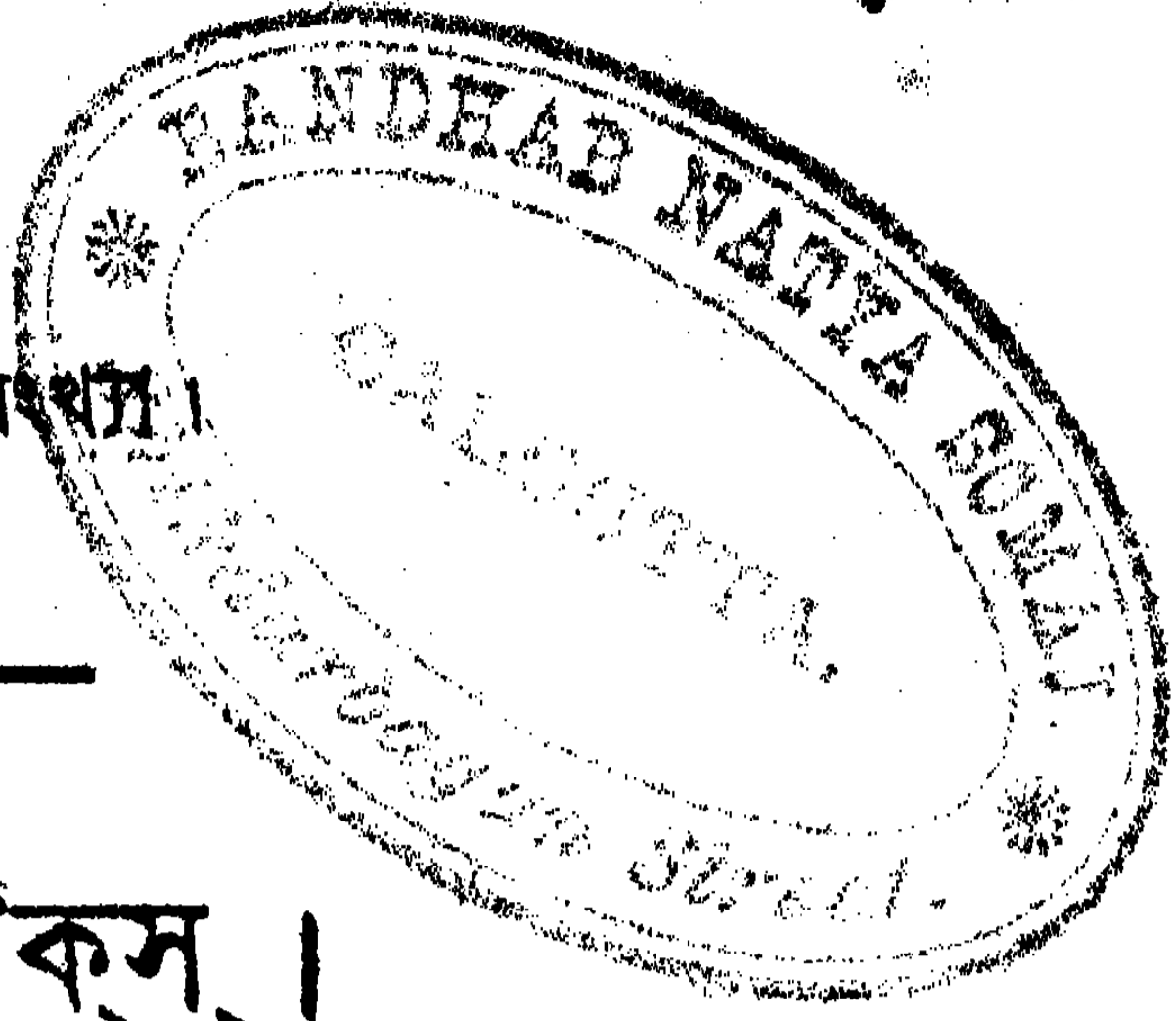
যদি নবেলে আপনার আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহা হইলেও আমরা অর্থাৎ খোষনবীশ কোম্পানী কিছু অপ্রস্তুত নহি । আমরা উত্তম নবেল লিখিতে পারি, তবে কি না ইচ্ছা ছিল যে, বাজে নবেল না লিখিয়া ডনকুইক্সোট বা জিলবার পরিশিষ্টে লিখিব । দুর্ভাগ্যবশতঃ দুইখানি পুস্তকের একখানিও এ পর্যন্ত আমাদের পড়া হয় নাই । সম্প্রতি মেকলের এসের পরিশিষ্টে লিখিয়া দিলে আপনার কার্য হইতে পারে কি ? সেও নবেল বটে ।

যদি কাব্য চাহেন, তবে মিত্রাক্ষর অমিত্রাক্ষর বিশেষ করিয়া বলিবেন । মিত্রাক্ষর আমাদের হইতে হইবে না—আমরা পয়ার মিলাইতে পারি না । তবে অমিত্রাক্ষর যত বলিবেন, তত পারিব । সম্প্রতি খোষনবীশের ছানা, জীমূত-নাদবধ বলিয়া একখানি কাব্যের প্রথম খণ্ড লিখিয়া রাখিয়াছেন । ইহা প্রায় মেঘনাদবধের তুল্য—দুই চারিটা নামের প্রভেদ আছে মাত্র । চাই ?

আর যদি লঘু গুরু সব ছাড়িয়া, খোষনবীশি রচনা ছাড়িয়া, সাফ কমলাকান্তি চক্ষে আপনার রুচি হয়, তবে তাও বলুন, আমার প্রণীত ছাই ভস্ম যাহা কিছু লেখা থাকে, তাহা পাঠাই । মনে থাকে যেন, তাহার বিনিময়ে আফিস লইব ! ওজন কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইব—এক তিল ছাড়িব না !

আপনি কি রাজি ? আপনি রাজি হউন বা না হউন, আমি রাজি ।

দ্বিতীয় সংখ্যা।



পলিটিক্‌স্‌ ।

শ্রীচরণেযু, আফিঙ্গ পাইয়াছি। অনেকটা আফিঙ্গ পাঠাইয়াছেন—শ্রীচরণকমলেষু। আপনার শ্রীচরণকমলযুগলেষু—আরও কিছু আফিঙ্গ পাঠাইবেন।

কিন্তু শ্রীচরণকমলযুগল হইতে কমলাকান্তের প্রতি এমন কঠিন আক্রমণ কি জন্য হইয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না। আপনি লিখিয়াছেন যে, এক্ষণে নয় আইনে অন্যত্র কিছু পলিটিক্‌স্‌ কম পড়িবে—তুমি কিছু পলিটিক্‌স্‌ ঝাড়িলে ভাল হয়। কেন মহাশয়? আমি কি দোষ করিয়াছি যে, পলিটিক্‌স্‌ সর্বজেক্ট রূপী আমি ইট মাথায় মারিব? কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী ব্রাহ্মণ, তাহাকে পলিটিক্‌স্‌ লিখিবার আদেশ কেন করিয়াছেন? কমলাকান্ত স্বার্থপর নহে—আফিঙ্গ ভিন্ন জগতে আমার স্বার্থ নাই, আমার উপর পলিটিক্‌স্‌র চাপ

কেন ? আমি রাজা না খোষামুদে, না জুয়াচোর, না ভিক্ষুক, না সম্পাদক, যে আমাকে পলিটিক্স লিখিতে বলেন ? আপনি আমার দপ্তর পাঠ করিয়াছেন, কোথায় আমার এমন স্থূল বুদ্ধির চিহ্ন পাইলেন যে, আমাকে পলিটিক্স লিখিতে বলেন ? আফিসের জন্য আমি আপনার খোষামোদ করিয়াছি বটে, কিন্তু তাই বলিয়া আমি এমন স্বার্থপর চাটুকর অদ্যাপি হই নাই যে, পলিটিক্স লিখি । ধিক্ আপনার সম্পাদকতায় ! ধিক্ আপনার আফিস দানে ! আপনি আজিও বুদ্ধিতে পারেন নাই যে, কমলাকান্ত শর্ম্মা উচ্চাশয় কবি, কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী পলিটিশ্যান নহে ।

আপনার এই আদেশ প্রাপ্তে বড়ই মনঃক্ষুব্ধ হইয়া এক পতিত বৃক্ষের কাণ্ডোপরি উপবেশন করিয়া বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের বুদ্ধিবৈপরীত্য ভাবিতেছিলাম । কি করি ! ভরি টাক্ আফিস গলদেশের অধোভাগে যেন তেন প্রকারেণ প্রেরণ করিলাম । সম্মুখে শিবে কলুর বাড়ী— বাড়ীর প্রাঙ্গনে দুই তিনটা বলদ বাঁধা আছে—

মাটিতে পোঁতা নাদায় কলুপত্নীর হস্তমিশ্রিত
খলি-মিশান ললিত বিচালিচূর্ণ গোগণ মুদিত-
নয়নে, স্নেহের আবেশে কবলে গ্রহণ করিয়া
ভোজন করিতেছিল । আমি কতকটা স্থিরচিত্ত
হইলাম—এখানে ত পলিটিক্স নাই ! এই নাদার
মধ্য হইতে গোগণ পলিটিক্স-বিকার-শূন্য অকৃ-
ত্রিম সুখ পাইতেছে—দেখিয়া কিছু তৃপ্ত হই-
লাম । তখন অহিফেন-প্রসাদ-প্রসন্ন চিত্তে
লোকের এই পলিটিক্স-প্রিয়তা সম্বন্ধে চিন্তা
করিতে লাগিলাম । আমার তখন বিদ্যাসুন্দর
যাত্রার একটি গান মনে পড়িল ।

বোবার ইচ্ছা কথা ফুটে,
খোঁড়ার ইচ্ছা বেড়ায় ছুটে,
তোমার ইচ্ছা বিদ্যা ঘটে

ইচ্ছা বটে—ইত্যাদি ।

আমাদের ইচ্ছা পলিটিক্স—হুণ্ডায় হুণ্ডায়
রোজ রোজ, পলিটিক্স ; কিন্তু বোবার বাক-
চাতুরীর কামনার মত, খঞ্জের দ্রুতগমনের
আকাঙ্ক্ষার মত, অন্ধের চিত্রদর্শনলালসার
মত, হিন্দু বিধবার স্বামিপ্রণয়াকাঙ্ক্ষার মত,

আমার মনে আদরের আদরিণী গৃহিণীর আদরের সাধের মত, হাফ্ফাস্পদ, ফলিবার নহে । ভাই পলিটিক্স ওয়ালারা ! আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী তোমাদিগের হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার শশুরবাড়ী আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বা-রোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্স নাই । “জয় রাধে কৃষ্ণ ! ভিক্ষা দাও গো !” ইহাই তাহাদের পলিটিক্স । তন্নিম্ন অন্য পলিটিক্স যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এ দেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই ।

এইরূপ ভাবিতেছিলাম, ইত্যবসরে দেখিলাম, শিবু কলুর পৌত্র দশমবর্ষীয় বালক, এক কামি ভাত আনিয়া উঠানে বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল । দূর হইতে একটি শ্বেতকৃষ্ণ কুকুর তাহা দেখিল । দেখিয়া, এক বার দাঁড়াইয়া, চাহিয়া চাহিয়া, ক্ষুণ্ণ মনে জিহ্বা নিষ্কৃত করিল । অমলধবল অন্নরাশি কাংস্যপাত্রে কুমুদামবৎ বিরাজ করিতেছে—কুকুরের পেটটা দেখিলাম, নিতান্ত পড়িয়া আছে । কুকুর চাহিয়া চাহিয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, এক বার আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া

হাই তুলিল। তার পর ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে ধীরে, এক এক পদ অগ্রসর হইল, এক এক বার কলুর পুত্রের অন্তপরিপূরিত বদন প্রতি আড়নয়নে কটাক্ষ করে, এক এক পা এগোয়। অকস্মাৎ অহিফেন-প্রসাদে দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিলাম—দেখিলাম, এই ত পলিটিক্স,—এই কুকুর ত পলিটিশ্যান! তখন মনোভিনিবেশ পূর্বক দেখিতে লাগিলাম যে, কুকুর পাকা পলিটিকেল চাল চালিতে আরম্ভ করিল। কুকুর দেখিল—কলুপুত্র কিছু বলে না—বড় সদাশয় বালক—কুকুর কাছে গিয়া, থাবা পাতিয়া বসিল। ধীরে ধীরে লাঙ্গুল নাড়ে, আর কলুর পোর মুখপানে চাহিয়া, হ্যা-হ্যা করিয়া হাঁপায়। তাহার ক্ষীণ কলেবর, পাতলা পেট, কাতর দৃষ্টি, এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস দেখিয়া কলুপুত্রের দয়া হইল, তাহার পলিটিকল্ এজিটেশ্যান সফল হইল;—কলুপুত্র একখানা মাছের কাঁটা উত্তম করিয়া চুষিয়া লইয়া, কুকুরের দিকে ফেলিয়া দিল। কুকুর আগ্রহ সহকারে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, তাহা চর্বণ, লেহন, গেলন এবং হজম-

করণে প্রবৃত্ত হইল। আনন্দে তাহার চক্ষু বুজিয়া আসিল।

যখন সেই মৎস্যকণ্টকসম্বন্ধে এই স্তম্ভং কার্য উত্তমরূপে সমাপন হইল, তখন সেই সূচতুর পলিটিশ্যানের মনে হইল যে, আর এক-খানা কাঁটা পাইলে ভাল হয়। এইরূপ ভাবিয়া, পলিটিশ্যন আবার বালকের মুখপানে চাহিয়া রহিল। দেখিল, বালক আপনমনে গুড় তেঁতুল মাখিয়া ঘোর রবে ভোজন করিতেছে—কুকুর পানে আর চাহে না। তখন কুকুর একটি bold move অবলম্বন করিল—জাত পলিটিশ্যন, না হবে কেন? সেই রাজনীতিবিদ সাহসে ভর করিয়া আর একটু অগ্রসর হইয়া বসিলেন। এক বার হাই তুলিলেন। তাহাতেও কলুর ছেলে চাহিয়া দেখিল না। অতঃপর কুকুর য়ু দু য়ু দু শব্দ করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, বলিতেছিলেন, হে রাজাধিরাজ কলুপুত্র! কাঙ্গালের পেট ভরে নাই। তখন কলুর ছেলে তাহার পানে চাহিয়া দেখিল। আর মাছ নাই—এক মুষ্টি ভাত কুকুরকে ফেলিয়া দিল। পুরন্দর যে সুখে নন্দন-

কাননে বসিয়া সুধা পান করেন, কার্ডিলেন উলসি বা কার্ডিলেন জেরেজ যে সুখে কার্ডিলেনের টুপি পরিয়াছিলেন, কুকুর সেই সুখে সেই অন্নমুষ্টি ভোজন করিতে লাগিল । এমত সময়ে, কলুগৃহিণী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল । ছেলের কাছে একটা কুকুর ম্যাক্ ম্যাক্ করিয়া ভাত খাইতেছে—দেখিয়া কলুপত্নী রোষ-কষায়িত-লোচনে এক ইষ্টকখণ্ড লইয়া কুকুর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন । রাজনীতিজ্ঞ তখন আহত হইয়া, লাস্ক লসংগ্রহপূর্বক বহুবিধ রাগ রাগিণী আলাপচারী করিতে করিতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল ।

এই অবসরে আর একটি ঘটনা দৃষ্টিগোচর হইল । যত ক্ষণ ক্ষীণজীবী কুকুর আপন উদর-পূর্তির জন্য বহুবিধ কৌশল করিতেছিল, তত ক্ষণ এক বৃহৎকায় বৃষ আসিয়া কলুর বলদের সেই খোলবিচালি-পরিপূর্ণ নাদায় মুখ দিয়া জাব্না খাইতেছিল—বলদ বৃষের ভীষণ শৃঙ্গ এবং স্কুল-কায় দেখিয়া, মুখ সরাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কাতরনয়নে তাহার আহারনেপুণ্য দেখিতেছিল ।

কুকুরকে দূরীকৃত করিয়া, কলুগৃহিণী এই দস্যুতা দেখিতে পাইয়া এক বংশখণ্ড লইয়া বৃষকে গো-ভাগাড়ে যাইবার পরামর্শ দিতে দিতে তৎপ্রতি ধাবমানা হইলেন । কিন্তু ভাগাড়ে যাওয়া দূরে থাকুক—বৃষ এক পদও সরিল না—এবং কলুগৃহিণী নিকটবর্তিনী হইলে বৃহৎ শৃঙ্গ হেলাইয়া, তাঁহার হৃদয়মধ্যে সেই শৃঙ্গাভাগ প্রবেশের সম্ভাবনা জানাইয়া দিল । কলুপত্নী তখন রণে ভঙ্গ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন । বৃষ, অবকাশমতে নাদা নিঃশেষ করিয়া হেলিতে তুলিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল ।

আমি ভাবিলাম যে, এও পলিটিক্স । দুই রকমের পলিটিক্স দেখিলাম—এক কুকুরজাতীয়, আর এক বৃষজাতীয় । বিস্মার্ক এবং গর্শাক্‌ফ এই বৃষের দরের পলিটিশ্যান—আর উল্ফ হইতে আমাদের পরমাত্মীয় রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর পর্যন্ত অনেকে এই কুকুরের দরের পলিটিশ্যান ।

বাস্কালির মনুষ্যত্ব ।

মহাশয় ! আপনাকে পত্র লিখিব কি—
লিখিবার অনেক শত্রু । আমি এখন যে কুঁড়ে
ঘরে বাস করি, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার পাশে
গোটা দুই তিন ফুলগাছ পুঁতিয়াছি । মনে
করিয়াছিলাম, কমলাকান্তের কেহ নাই—এই
ফুলগুলি আমার সখা সখী হইবে । খোষামোদ
করিয়া ইহাদের ফুটাইতে হইবে না—টাকা
ছড়াইতে হইবে না, গহনা দিতে হইবে না,
মন-যোগান গোছ কথা বলিতে হইবে না, আপ-
নার সুখে উহারা আপনি ফুটিবে । উহাদের
হাসি আছে—কান্না নাই ; আমোদ আছে—
রাগ নাই । মনে করিলাম, যদি প্রসন্ন গোরালিনী
গিয়াছে তবে এই ফুলের সঙ্গে প্রণয় করিব ।

তা, ফুল ফুটিল—তারা হাসিল । মনে করি-
লাম—মহাশয় গো ! কিছু মনে করিতে না

করিতে, ফুটন্ত ফুল দেখিয়া ভোমরার দল,—
লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে, ভোমরা বোলতা
মৌমাছি—বহুবিধ রসক্ষেপা রসিকের দল,
আমিয়া আমার ঘারে উপস্থিত হইলেন। তখন
গুন্ গুন্ ভন্ ভন্ ঝন্ ঝন্ ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া
হাড় জ্বালাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগকে
অনেক বুঝাইয়া বলিলাম যে, হে মহাশয়গণ! এ
সভা নহে, সমাজ নহে, এসোসিয়েশ্যন, লীগ,
সোসাইটি, ক্লব প্রভৃতি কিছুই নহে—কমলা-
কান্তের পর্ণকুটীর মাত্র, আপনাদিগের ঘ্যান্ ঘ্যান্
করিতে হয়, অন্যত্র গমন করুন—আমি কোন
রিজলিউশ্যনই দ্বিতীয়িত করিতে প্রস্তুত নহি;
আপনারা স্থানান্তরে প্রস্থান করুন। গুন্ গুনের
দল, তাঁহাতে কোন মতে সম্মত নহে—বরং
ফুলগাছ ছাড়িয়া আমার কুটীরের ভিতর হলা
করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই মাত্র আপনাকে
এক পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছিলাম—
(আফিঙ্গ ফুরাইয়াছে)—এমত সময়ে এক ভ্রমর
কুচকুচে কালো আসল বৃন্দাবনী কালাচাঁদ, ভোঁ
করিয়া ঘরের ভিতর উড়িয়া আমিয়া কানের

কাছে ঘ্যান্ ঘ্যান্ আরম্ভ করিলেন—লিখিব কি, মহাশয় ?

ভ্রমর বাধাজি নিশ্চিত মনে করেন, তিনি বড় সুরসিক—বড় সদ্বক্তা—তাঁহার ঘ্যান্ ঘ্যানানিতে আমার সর্বাপ জুড়াইয়া যাইবে। আমারই ফুলগাছের ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িয়া আসিয়া আমারই কানের কাছে ঘ্যান্ ঘ্যান্ ? আমার রাগ অসহ্য হইয়া উঠিল ; আমি তালবৃত্ত হস্তে ভ্রমরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন আমি ঘূর্ণন, বিঘূর্ণন, সংঘূর্ণন প্রভৃতি বহুবিধ বক্রগতিতে তালবৃত্তাস্ত্র সঞ্চালন করিতে লাগিলাম ; ভ্রমরও ডীন, উড্ডীন, প্রডীন, সমাডীন প্রভৃতি বহুবিধ কোশল দেখাইতে লাগিল। আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী—দপ্তর-মুক্তাবলীর প্রণেতা, কিন্তু হায়, মনুষ্যবীৰ্য্য ! তুমি অতি অসার ! তুমি চিরদিন মনুষ্যকে প্রতারিত করিয়া শেষ আপন অসারতা প্রমাণীকৃত কর ! তুমি আমার ক্ষেত্রে হানিবলকে, পলটোবার ক্ষেত্রে চার্লসকে, ওয়াটলুর ক্ষেত্রে নেপোলিয়নকে, এবং আজি এই ভ্রমরসময়ে কমলাকান্তকে বঞ্চিত করিলে !

আমি যত পাখা ঘুরাইয়া বায়ু সৃষ্টি করিয়া ভ্রমরকে উড়াইতে লাগিলাম, ততই সে দুরাত্মা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমার মাথামুণ্ড বেড়িয়া বেড়িয়া চোঁ বেঁা করিতে লাগিল। কখনও সে আমার বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত হইয়া, মেঘের আড়াল হইতে ইন্দ্রজিতের ন্যায় রণ করিতে লাগিল, কখনও কুম্ভকর্ণনিপাতী রামসৈন্যের ন্যায় আমার বগলের নীচে দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল; কখনও স্যাম্পসনের ন্যায় শিরোক্লহমধ্যে আমার বীৰ্য্য সংন্যস্ত মনে করিয়া, আমার নীরদ-নিন্দিত কুঞ্চিত কেশদামমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভেরী বাজাইতে লাগিল। তখন দংশনভয়ে অস্থির হইয়া আমি রণে ভঙ্গ দিলাম। ভ্রমর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। সেই সময়ে চৌকাঠ পায়ে বাঁধিয়া কমলাকান্ত—
 “পপাত ধরণীতলে !!!” এই সংসারসমরে মহা-
 রথী শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী—যিনি দারিদ্র্য,
 চির-কৌমার এবং অহিফেন প্রভৃতির দ্বারাও
 কখন পরাজিত হয়েন নাই—হায়! তিনি এই
 ক্ষুদ্র পতঙ্গ কর্তৃক পরাজিত হইলেন।

তখন ধূল্যবলুণ্ঠিত শরীরে ঘিরেফরাজের

নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। যুক্ত-
করে বলিলাম, “হে দ্বিরেকসত্তম ! কোন্ অপ-
রাধে দুঃখী ব্রাহ্মণ তোমার নিকট অপরাধী যে,
তুমি তাহার লেখা পড়ার ব্যাঘাত করিতে আসি-
য়াছ ? দেখ, আমি এই বঙ্গদর্শনে পত্র লিখিতে
বসিয়াছি—পত্র লিখিলে আফিস আসিবে—
তুমি কেন ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া তাহার বিঘ্ন কর ?”
আমি প্রাতে একখানি বাঙ্গালা নাটক পড়িতে-
ছিলাম—তখন অকস্মাৎ সেই নাটকীয় রাগগ্রস্ত
হইয়া বলিতে লাগিলাম—“হে ভৃঙ্গ ! হে অনঙ্গ-
রঙ্গ তরঙ্গবিক্ষেপকারিন্ ! হে দুর্দান্ত পাষণ্ডভণ্ড-
চিত্তলণ্ডণ্ডকারিন্ ! হে উদ্যানবিহারিন্—কেন
তুমি ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতেছ ? হে ভৃঙ্গ ! হে
দ্বিরেক ! হে ষট্পদ ! হে অলে ! হে ভ্রমর !
হে ভোমরা ! হে ভেঁ ভেঁ ।—”

ভ্রমর রূপ করিয়া আসিয়া সামনে বসিল।
তখন গুন্ গুন্ করিয়া গলা দুৱস্ত করিয়া বলিতে
লাগিল—আমি অহিফেন-প্রসাদে সকলেরই
কথা বুঝিতে পারি—আমি স্থিরচিত্তে শুনিতে
লাগিলাম।

ভৃঙ্গরাজ বলিতে লাগিলেন, “হে বিপ্র !
আমার উপর এত চোট কেন ? আমি কি
একাই ঘ্যান্-ঘেনে ! তোমার এ বঙ্গভূমে জন্ম-
গ্রহণ করিয়া ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিব না ত কি করিব ?
বাঙ্গালি হইয়া কে ঘ্যান্ ঘ্যানানি ছাড়া ? কোন্
বাঙ্গালির ঘ্যান্ ঘ্যানানি ছাড়া অন্য ব্যবসা
আছে ? তোমাদের মধ্যে যিনি রাজা মহারাজা
কি এমনি একটা কিছু মাথায় পাগড়ি ও হই-
লেন, তিনি গিয়া বেল্ভিডিয়রে ঘ্যান্ ঘ্যান্
আরম্ভ করিলেন । যিনি হইবেন উমেদ রাখেন,
তিনি গিয়া রাত্রিদিবা রাজদ্বারে ঘ্যান্ ঘ্যান্
করেন । যিনি কেবল একটি চাকরির উমেদ-
ওয়ার—তার ঘ্যান্ ঘ্যানানির ত আর অন্ত নাই ।
বাঙ্গালি বারু যিনিই দুই চারিটা ইংরেজি বোল
শিখিয়াছেন, তিনি অমনি উমেদওয়াররূপে পরি-
ণত হইয়া, দরখাস্ত বা টিকিট হাতে দ্বারে দ্বারে
ঘ্যান্ ঘ্যান্—ডাঁশমাছির মত খাবার সময়ে,
শোবার সময়ে, বস্‌বার সময়ে, দাঁড়াবার সময়ে,
দিনে, রাত্রে, প্রাছে, অপরাছে, মধ্যাছে, সায়াছে—
ঘ্যান্ ঘ্যান্ ঘ্যান্ ! যিনি উমেদওয়ারি ছাড়িয়া

স্বাধীন হইয়া উকীল হইলেন, তিনি আবার
 সনদী ঘ্যান্ ঘেনে। সত্য মিথ্যার সাগরসঙ্গমে
 প্রাতঃস্নান করিয়া উঠিয়া, যেখানে দেখেন, কাঠ-
 গড়ার ভিতর বিড়ে মাথায় সরকারি জুজু বসিয়া
 আছে—বড় জজ, ছোট জজ, সবজজ, ডিপুটি,
 মুন্সেফ—সেইখানে গিয়া সেই পেশাদার ঘ্যান্
 ঘেনে, ঘ্যান্ ঘ্যানানির ফোয়ারা খুলিয়া দেন।
 কেহ বা মনে করেন, ঘ্যান্ ঘ্যানানির চোটে
 দেশোদ্ধার করিবেন—সভাতলে ছেলে বুড়া
 জমা করিয়া ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতে থাকেন। কোন
 দেশে বৃষ্টি হয় নাই—এমো বাপু ঘ্যান্ ঘ্যান্
 করি; বড় চাকরি পাই না—এমো বাপু ঘ্যান্
 ঘ্যান্ করি—রামকান্তের মা মরিয়াছে—এমো
 বাপু স্মরণার্থ ঘ্যান্ ঘ্যান্ করি। কাহারও বা
 ভাতেও মন উঠে না—তঁারা কাগজ কলম
 লইয়া, হপ্তায় হপ্তায়, মাসে মাসে, দিন দিন ঘ্যান্
 ঘ্যান করেন। আর তুমি যে বাপু আমার ঘ্যান্
 ঘ্যানানিতে এত রাগ করিতেছ, তুমি ও কি
 করিতে বসিয়াছ? বঙ্গদর্শন সম্পাদকের কাছে
 কিছু আফিসের যোগাড় করিবে বলিয়া ঘ্যান্

ঘ্যান্ করিতে বসিয়াছ । আমার চেঁ। বোঁই কি
এত কটু ?

তোমায় সত্য বলিতেছি, কমলাকান্ত !
তোমাদের জাতির ঘ্যান্ ঘ্যানানি আর ভাল
লাগে না । দেখ আমি যে ক্ষুদ্র পতঙ্গ, আমিও
শুধু ঘ্যান্ ঘ্যান্ করি না—মধু সংগ্রহ করি আর
হুল ফুটাই । তোমরা না জান মধু সংগ্রহ করিতে,
না জান হুল ফুটাইতে—কেবল ঘ্যান্ ঘ্যান্ পার ।
একটা কাজের সঙ্গে খোঁজ নাই—কেবল কাঁদুনে
মেয়ের মত দিবারাত্রি ঘ্যান্ ঘ্যান্ । একটু
বকাবকি লেখালেখি কম করিয়া কিছু কাজে
মন দাও—তোমাদের শ্রীরুদ্ধি হইবে । মধু
করিতে শেখ—হুল ফুটাইতে শেখ । তোমা-
দের রসনা অপেক্ষা আমাদের হুল শ্রেষ্ঠ—
বাক্যবাণে মানুষ মরে না ; আমাদের হুলের
ভয়ে জীবলোক সদা সশঙ্কিত ! স্বর্গে ইন্দ্রের
বজ্র, মর্ত্যে ইংরেজের কামান, আর আকাশ-
মার্গে আমাদের হুল ! সে যাক, মধু কর ; কাজে
মন দাও । নিতান্ত যদি দেখ, রসনাকণ্ড মন
রোগ অন্য কাজে মন যায় না—জিবে কাণ্ডিকি

দিয়া ঘা কর—অগত্যা কাজে মন যাইতে পারে। আর শুধু ঘ্যান্ ঘ্যান্ ভাল লাগে না।”

এই বলিয়া ভ্রমররাজ ভোঁ করিয়া উড়িয়া গেল ।

আমি ভাবিলাম যে, এই ভ্রমর অবশ্য বিশেষ বিজ্ঞ পতঙ্গ । শুনা আছে, মনুষ্যের পদবৃদ্ধি হইলেই সে বিজ্ঞ বলিয়া গণ্য হয় । এই জন্য দ্বিপদ মনুষ্য হইতে চতুষ্পদ পশু—পক্ষান্তরে যে সকল মনুষ্যের পদবৃদ্ধি হইয়াছে—তাহারা অধিক বিজ্ঞ বলিয়া গণ্য । এই ষট্পদের—একখানি না দুখানি না—ছয় ছয়খানি পা ! অবশ্য এ ব্যক্তি বিশেষ বিজ্ঞ হইবে—ইহার অসামান্য পদবৃদ্ধি দেখা যায় । এই বিজ্ঞ পতঙ্গের পরামর্গ অবহেলন করি কি প্রকারে ? অতএব আপাততঃ ঘ্যান্ ঘ্যানানি বন্ধ করিলাম—কিন্তু মধুসংগ্রহের আশাটা রহিল । বঙ্গদর্শন পুষ্প হইতে অহিফেন মধু সংগ্রহ হইবে এই ভরসায় প্রাণ ধারণ করে—

আপনার আজ্ঞাবহ

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী ।

বুড়া বয়সের কথা।

সম্পাদক মহাশয়! আফিস পৌঁছে নাই, বড় কষ্ট গিয়াছে। আজ যাহা লিখিলাম, তাহা বিস্তারিত লোচনে লেখা। নিজ বুদ্ধিতে, অহিফেন প্রসাদাৎ নহে। একটা মনের দুঃখের কথা লিখিব।

বুড়া বয়সের কথা লিখিব। লিখি লিখি মনে করিতেছি, কিন্তু লিখিতে পারিতেছি না। হইতে পারে যে, এই নিদারুণ কথা আমার কাছে বড় প্রিয়,—আপনার মন্ব্যস্তিক দুঃখের পরিচয় আপনার কাছে বড় মিষ্ট লাগে, কিন্তু আমি লিখিলে পড়িবে কে? যে যুবা, কেবল সেই পড়ে; বুড়ায় কিছু পড়ে না। বোধ হয়, আমার এই বুড়া বয়সের কথার পাঠক জুটিবে না।

অতএব আমি ঠিক বুড়া বয়সের কথা লিখিব না। বলিতে পারি না; বৈতরণীর তরঙ্গাভিহত

জীবনের সেই শেষ সোপানে আজিও পদার্পণ করি নাই ; আজিও আমার পারের কড়ি সংগ্রহ করা হয় নাই । আমার মনে মনে বিশ্বাস যে, সে দিন আজিও আসে নাই । তবে যৌবনেও আর আমার দাবি দাওয়া নাই ; মিয়াদি পাট্টার মিয়াদ ফুরাইয়াছে । এক দিকে, মিয়াদ অতীত হইল, কিন্তু বাকি বকেয়া আদায় উম্মল করা হয় নাই, তাহার জন্য কিছু পীড়াপীড়ি আছে ; যৌবনের আখিরি করিয়া ফারখতি লইতে পারি নাই । তাহার উপর মহাজনেরও কিছু ধারি ; অনারুষ্টির দিনে অনেক ধার করিয়া খাইয়াছিলাম, শোধ দিতে পারি, এমনত সাধ্য নাই । তার উপর পাট্টনির কড়ি সংগ্রহ করিবার সময় আসিল । আমার এমন দুঃখের সময়ের দুটো কথা বলিব, তোমরা যৌবনের সুখ ছাড়িয়া কি এক বার গুনিবে না ?

আগে আসল কথাটা মীমাংসা করা যাক—
আমি কি বুড়া ? আমি আমার নিজের কথাই বলিতেছি এমনত নহে, আমি বুড়া, না হয় যুবা, দুইয়ের এক স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি । কিন্তু

যাঁহারই বয়সটা একটু দোটা না রকম—যাঁরই
 ছায়া পূর্বদিকে হেলিয়াছে, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা
 করি, মীমাংসা করুন দেখি, আপনি কি বুড়া।
 আপনার কেশগুলি, হয় ত আজিও অনিন্দ্য
 ভ্রমরকৃষ্ণ, হয় ত আজিও দন্ত সকল অবিচ্ছিন্ন
 মুক্তামালার লজ্জাস্থল, হয় ত আপনার নিদ্রা
 অদ্যাপি এমন প্রগাঢ় যে, দ্বিতীয় পক্ষের ভার্য্যাও
 তাহা ভাঙ্গিতে পারেন না ;—তথাপি, হয় ত
 আপনি প্রাচীন। নয় ত, আপনার কেশগুলি
 শাদা কালোয় গঙ্গা যমুনা হইয়া গিয়াছে, দশন
 মুক্তাপাতি ছিঁড়িয়া গিয়াছে, দুই একটি মুক্তা
 হারাইয়া গিয়াছে—নিদ্রা, চক্ষুর প্রতারণামাত্র,
 তথাপি আপনি যুবা। তুমি বলিবে ইহার অর্থ,
 “বয়সেতে বিজ্ঞ নহে, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে।” তাহা
 নহে—আমি বিজ্ঞতার কথা বলিতেছি না,
 প্রাচীনতার কথা বলিতেছি। প্রাচীনতা বয়-
 সেরই ফল, আর কিছুরই নহে। ধাতু বিশেষে
 কিছু তারতম্য হয়, কেহ চল্লিশে বুড়া, কেহ
 বিয়াল্লিশে যুবা। কিন্তু তুমি কখন দেখিবে
 না যে, বয়সে অধিক তারতম্য ঘটে। যে

পঁয়তাল্লিশে যুবা বলাইতে চায়, সে হয় যম-ভয়ে
 নিতান্ত ভীত, নয় তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছে ;
 যে পঁয়ত্রিশে বুড়া বলাইতে চায়, সে হয় বড়াই
 ভালবাসে, নয় পীড়িত, নয় কোন বড় দুঃখে
 দুঃখী ।

কিন্তু এই অর্ধেক পথ অতিবাহিত করিয়া,
 প্রথম চস্মাখানি হাতে করিয়া রুমাল দিয়া
 মুছিতে মুছিতে ঠিক বলা দায় যে, আমি বুড়া
 হইয়াছি কি না । বুঝি বা হইয়াছি । বুঝি হই
 নাই । মনে মনে ভরসা আছে, একটু চক্ষুর দোষ
 হোক, দুই এক গাছা চুল পাকুক, আজিও
 প্রাচীন হই নাই । কই, কিছু ত প্রাচীন হয়
 নাই ? এই চিরপ্রাচীন ভুবনমণ্ডল ত আজিও
 নবীন ; আমার প্রিয় কোকিলের স্বর প্রাচীন হয়
 নাই ; আমার সৌন্দর্য্যমাখা, হীরাবসান, গঙ্গার
 ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গ ত প্রাচীন হয় নাই ; প্রভাতের
 বায়ু, বকুল কামিনীর গন্ধ, বৃক্ষের শ্যামলতা, এবং
 নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা, কেহ ত প্রাচীন হয় নাই—
 তেমনই সুন্দর আছে । আমি কেবল প্রাচীন হই-
 লাম ? আমি এ কথায় বিশ্বাস করিব না । পৃথি-

বীতে উচ্চ হাসি ত আজিও আছে, কেবল আমার হাসির দিন গেল ? পৃথিবীতে উৎসাহ, ক্রীড়া, রঙ্গ, আজিও তেমনি অপরিয়াপ্ত, কেবল আমারই পক্ষে নাই ? জগৎ আলোকময়, কেবল আমারই রাত্রি আসিতেছে ? সলমন কোম্পানির দোকানে বজ্রাঘাত হটক, আমি এ চসমা ভাঙ্গিয়া ফেলিব, আমি বুড়া বয়স স্বীকার করিব না।

তবু আসে—ছাড়ান যায় না। ধীরে ধীরে দিনে দিনে পলে পলে বয়শ্চোর আসিয়া, এ দেহ-পুর প্রবেশ করিতেছে—আমি যাহা মনে ভাবি না কেন, আমি বুড়া, প্রতি নিঃশ্বাসে তাহা জানিতে পারিতেছি। অন্যে হাসে, আমি কেবল ঠোঁট হেলাইয়া তাহাদিগের মন রাখি। অন্যে কাঁদে, আমি কেবল লোকলজ্জায় মুখ ভার করিয়া থাকি—ভাবি, ইহারা এ রূথা কালহরণ করিতেছে কেন ? উৎসাহ আমার কাছে পণ্ড্রম—আশা আমার কাছে আত্মপ্রতারণা। কই, আমার ত আশা ভরসা কিছু নাই ? কই—দূর হোক, যাহা নাই তাহা আর খুঁজিয়া কাজ নাই।

খুঁজিয়া দেখিব কি ? যে কুম্ভদাম এ জীবন-

কানন আলো করিত, পথিপার্শ্বে একে একে
 তাহা খসিয়া পড়িয়াছে । যে মুখমণ্ডল সকল
 ভালবাসিতাম, একে একে অদৃশ্য হইয়াছে, না
 হয় রৌদ্রবিশুদ্ধ বৈকালের কুলের মত, শুকাইয়া
 উঠিয়াছে । কই, আর এ ভগ্ন মন্দিরে, এ পরি-
 ত্যক্ত নাট্যশালায়, এ ভাঙ্গা মজলিষে সে উজ্জ্বল
 দীপাবলী কই ? একে একে নিবিয়া ঘাইতেছে ।
 কেবল মুখ নহে—হৃদয় । সে সরল, সে ভাল-
 বাসাপরিপূর্ণ, সে বিশ্বাসে দৃঢ়, সে সৌহার্দ্যে স্থির,
 অপরাধেও প্রসন্ন, সে বন্ধুহৃদয় কই ? নাই ।
 কার দোষে নাই ? আমার দোষে নহে । বন্ধুরও
 দোষে নহে । বয়সের দোষে অথবা যবের
 দোষে ।

তাতে ক্ষতি কি ? একা আসিয়াছি, একা
 যাইব—তাহার ভাবনা কি ? এ লোকালয়ের
 সঙ্গে আমার বনিয়া উঠিল না—আচ্ছা—রোখ-
 সোদ । পৃথিবী ! তুমি তোমার নিয়মিত পথে
 আবর্তন করিতে থাক, আমি আমার অভীষ্ট স্থানে
 গমন করি—তোমার আমার সম্বন্ধরহিত হইব
 —তাহাতে, হে মৃগয়ি জড়পিওগোরব-পীড়িতে

বস্তুকরে ! তোমারই বা ক্ষতি কি, আমারই বা ক্ষতি কি ? তুমি অনন্ত কাল, শূন্যপথে ঘুরিবে, আমি আর অল্প দিন ঘুরিব মাত্র । তার পরে তোমার কপালে ছাইগুলি দিয়া, ঘাঁর কাছে সকল জ্বালা জুড়ায়, তাঁর কাছে গিয়া সকল জ্বালা জুড়াইব

তবে, স্থির হইল এক প্রকার যে, বুড়া বয়সে পড়িয়াছি । এখন কর্তব্য কি ? “পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ ?” এ কোন গণ্ডমুখের কথা । আবার বন কোথা ? এ বয়সে, এই অটালিকাময়ী লোক-পূর্ণা আপনীসমাকুলা নগরই বন । কেন না, হে বর্ষীয়ান্ পাঠক ! তোমার আমার সঙ্গে আর ইহার মধ্যে কাহারও সহৃদয়তা নাই । বিপদকালে কেহ কেহ আসিয়া বলিতে পারে যে, “বুড়া ! তুমি অনেক দেখিয়াছ, এ বিপদে কি করিব বলিয়া দাও,—” কিন্তু, সম্পদকালে কেহই বলিবে না, “বুড়া ! আজি আমার আনন্দের দিন, তুমি আসিয়া আমাদের উৎসব বৃদ্ধি কর !” বরং আমোদ আহ্লাদ কালে বলিবে, “দেখ ভাই, যেন বুড়া বেটা জানিতে না পারে ।” তবে আর অরণ্যেরে বাকি কি ?

যেখানে আগে ভালবাসার প্রত্যাশা করিতে, এখন সেখানে তুমি কেবল ভয় বা ভক্তির পাত্র । যে পুত্র তোমার যৌবনকালে, তাহার শৈশবকালে, তোমার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়াও, অর্দ্ধ-নিদ্রিত অবস্থাতেই, ক্ষুদ্র হস্ত প্রসারণ করিয়া, তোমার অনুসন্ধান করিত, সে এখন লোকমুখে সম্বাদ লয়, পিতা কেমন আছেন । পরের ছেলে, সুন্দর দেখিয়া যাহাকে কোলে তুলিয়া, তুমি আদর করিয়াছিলে, সে এখন কালক্রমে লক্ষ-বয়ঃ, কর্কশকান্তি, হয় ত মহাপাপিষ্ঠ, পৃথিবীর পাপস্রোত বাড়াইতেছে, হয় ত, তোমারই দ্বেষক—তুমি কেবল কাঁদিয়া বলিতে পার, “ইহাকে আমি কোলে পিঠে করিয়াছি ।” তুমি যাহাকে কোলে বসাইয়া, ক, খ শিখাইয়াছিলে, সে হয় ত এখন লক্ষপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত, তোমার মুর্থতা দেখিয়া মনে মনে উপহাস করে । যাহারই ক্ষুণ্ণের বেতন দিয়া তুমি মানুষ করিয়াছিলে, সে হয় ত এখন তোমাকে টাকা ধার দিয়া, তোমারই কাঁছে সুদ খায় । তুমি যাহাকে শিখাইতে, হয় ত সেই তোমায় শিখাইতেছে । যে

তোমার অগ্রাহ্য ছিল, তুমি আজি তার অগ্রাহ্য ।
আর অরণ্যের বাকি কি ?

অন্তর্জগৎ ছাড়িয়া, বহির্জগতেও এইরূপ দেখিবে । যেখানে তুমি স্বহস্তে পুষ্পাদ্যান নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলে,—বাছিয়া বাছিয়া, গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, বিগোনিয়া, সাইপ্রেস অরকেরিয়া, আনিয়া পুঁতিয়াছিলে, পাত্রহস্তে স্বয়ং জলসিঞ্চন করিয়াছিলে, সেখানে দেখিবে, ছোলা মটরের চাস,—হারাধন পোদ গামছা কাঁদে, মোটা মোটা বলদ লইয়া, নিৰ্ব্বিলে লাঙ্গল দিতেছে—সে লাঙ্গলের ফাল তোমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিতেছে । যে অট্টালিকা তুমি যৌবনে অনেক সাধ মনে মনে রাখিয়া, অনেক সাধ পূরাইয়া, যত্নে নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলে, যাহাতে পালঙ্ক পাড়িয়া নয়নে নয়নে অধরে অধরে মিলাইয়া, ইহ-জীবনের অনশ্বর প্রণয়ের প্রথম পবিত্র সম্ভাষণ করিয়াছিলে, হয় ত দেখিবে, সে গৃহের ইষ্টক সকল দামু ঘোষের আস্তাবলের সুর্কির জন্য চূর্ণ হইতেছে ; যে পালঙ্কের ভগ্নাংশ লইয়া কৈলাসীর মা পাচিকা ভাতের হাঁড়িতে জ্বাল

দিতেছে—আর অরণ্যের বাকি কি ? সকল জ্বালার উপর জ্বালা, আমি সেই যৌবনে যাহাকে সুন্দর দেখিয়াছিলাম—এখন সে কুৎসিত । আমার প্রিয়বন্ধু দাস্ত্র মিত্র, যৌবনের রূপে ক্ষীত-কণ্ঠ কপোতের ন্যায় সগর্বে বেড়াইত—কত মাগী গঙ্গার ঘাটে, স্নানকালে তাহাকে দেখিয়া নমঃ শিবায় নমঃ বলিয়া ফুল দিতে, “দাস্ত্র মিত্রায় নমঃ” বলিয়া ফুল দিয়াছে । এখন সেই দাস্ত্র মিত্র শুষ্ককণ্ঠ, পলিতকেশ, দন্তহীন, লোল-চর্ম্ম, শীর্ণকায় । দাস্ত্র, একটা ত্রাণ্ডি আর তিনটা মুরগী জলপানের মধ্যে ছিল,—এখন দাস্ত্র নামা-বলীর ভরে কাতর, পাতে মাছের ঝোল দিলে, পাত মুছিয়া ফেলে । আর অরণ্যের বাকি কি ?

• গদার মাকে দেখ । যখন আমার সেই পুষ্পাদ্যানে, তরঙ্গিণী নামে যুবতী ফুল চুরি করিতে যাইত, মনে হইত, নন্দনকানন হইতে সচল সপুষ্প পারিজাত বৃক্ষ আনিয়া কে ছাড়িয়া দিয়াছে । তাহার অলকদাম লইয়া উদ্যান-বায়ু ক্রীড়া করিত, তাহার অঞ্চলে কাঁটা বিঁধিয়া দিয়া, গোলাপ গাছ রসকেলি করিত । আর

আজি গদার মাকে দেখ। বকাবকি করিতে
করিতে চাল ঝাড়িতেছে—মলিনবসনা, বিকট-
দশনা, তীব্ররসনা—দীর্ঘাঙ্গী, কৃষ্ণাঙ্গী, কৃশাঙ্গী,
লোলচন্দ্র, পলিতকেশ, শুষ্কবাহু, ককশ-কণ্ঠ।
এই সেই তরঙ্গিনী—আর অরণ্যের বাকি কি ?

তবে স্থির, বনে যাওয়া হবে না। তবে কি
করিব—

“শৈশবেহভ্যস্তবিদ্যানাং

যৌবনে বিষয়ৈষণাং।

বার্দ্ধকে মুনিবৃন্তিনাং

যোগেনান্তে তনুতাজাম্ ॥”

সর্বগুণবান্ রঘুগণের বার্কিকের এই ব্যবস্থা
কালিদাস করিয়াছেন। আমি নিশ্চিত বলিতে
পারি—কালিদাস চল্লিশ পার হইয়া রঘুবংশ
লিখেন নাই। তিনি যে রঘুবংশ যৌবনে
লিখিয়াছিলেন, এবং কুমারসম্ভব চল্লিশ পার
করিয়া লিখিয়াছিলেন, তাহা আমি দুইটি কবিতা
উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি—

প্রথম অজবিলাপে,

“ইদমুচ্ছ সিতালকং মুখং

তববিশ্রান্তকণ্ঠং হুনোতি মাং।

নিশিসুপ্তমিবৈকপঙ্কজং
বিরতাত্যন্তরষট্ পদস্বনং ॥” *

এটি যৌবনের কাম্মা ।

তার পর রতিবিলাপে,

“গতএব ন তে নিবর্ত্ততে

স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ ।

অহমস্য দর্শেব পশ্য মা-

মবিসহ ব্যসনেন ধূমিতাম্ ॥” †

এটি বুড়া বয়সের কাম্মা ।—

তা যাই হউক, কালিদাস বুড়া বয়সের
গৌরব বুঝিলে কখনও বৃদ্ধের কপালে মুনিবৃত্তি
লিখিতেন না । বিস্মার্ক, মোল্ট্কে ও ফ্রেডে-
রিক' উইলিয়ম' বুড়া ; তাঁহারা মুনিবৃত্তি অবলম্বন

* বায়ুবশে অলকা গুলিন চালিত হইতেছে—অথচ বাক্য
হীন তোমার এই মুখ রাত্রিকালে প্রমুদিত, সুতরাং অত্যন্তবে
ভ্রমর-গুঞ্জন-রহিত একটি পদ্বের শ্রায় আমাকে ব্যথিত
করিতেছে ।

† তোমার সেই সখা বায়ুতাড়িত দীপের ন্যায় পরলোকে
গমন করিয়াছেন, আর ফিরিবেন না । আমি নির্বাণিত
দীপের দশাবৎ অসহ দুঃখে ধূমিত হইতেছি দেখ ।

করিলে—জর্মান ঐকজাত্য কোথা থাকিত ?
 টিয়র প্রাচীন—টিয়র মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে
 ফ্রান্সের স্বাধীনতা এবং সাধারণতন্ত্রাবলম্বন
 কোথা থাকিত ? গ্লাডষ্টোন এবং ডিশ্লেইলি বুড়া
 —তঁাহারা মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে পার্লি-
 মেন্টের রিফর্ম এবং আয়ারিশ্ চর্চের ডিসেপ্টা-
 বিষয়ে কোথা থাকিত ?

প্রাচীন বয়সই বিষয়েষার সময়। আমি
 অল্প-দলুহীন ত্রিকালের বুড়ার কথা বলিতেছি
 না—তঁাহারা দ্বিতীয় শৈশবে উপস্থিত। যাঁহারা
 আর যুবা নুনা বলিয়াই বুড়া, আমি তাঁহাদিগের
 কথা বলিতেছি। যৌবন কর্মের সময় বটে,
 কিন্তু তখন কাজ ভাল হয় না। একে বুদ্ধি
 অপরিপক্ব, তাহাতে আবার রাগ ঘেঁষ ভোগাসক্তি,
 এবং স্ত্রীগণের অনুসন্ধান তাহা সতত হীন-
 প্রভ ; এজন্য মনুষ্য যৌবনে সচরাচর কার্যক্ষম
 হয় না। যৌবন অতীতে মনুষ্য বহুদর্শী, স্থির-
 বুদ্ধি, লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ, এবং ভোগাসক্তির অনধীন,
 এজন্য সেই কার্যকারিতার সময়। এই জন্য,
 আমার পরামর্শ, যে বুড়া হইয়াছি বলিয়া, কেহ

স্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মুনিবৃত্তির ভান করিবে না। বার্ককোও বিষয়চিন্তা করিবে।

তোমরা বলিবে, এ কথা বলিতে হইবে না ; কেহই জীবন থাকিতে ও শক্তি থাকিতে বিষয়-চেষ্ঠা পরিত্যাগ করে না। মাতৃস্তনপান অবধি উইল করা পর্য্যন্ত আবালবৃদ্ধ কেবল বিষয়া-শেষণে বিভ্রত। সত্য, কিন্তু আমি সেরূপ বিষয়ানুসন্ধানে বৃদ্ধকে নিযুক্ত করিতে চাহিতেছি না। যৌবনে যে কাজ করিয়াছ, সে আপনার জন্য ; ভার পর যৌবন গেলে যত কাজ করিবে, পরের জন্য। ইহাই আমার পরামর্শ। ভাবিও না যে, আজিও আপনার কাজ করিয়া উঠিতে পারিলাম না—পরের কাজ করিব কি ? আপনার কাজ ফুরায় না—যদি মনুষ্যজীবন লক্ষ বর্ষ পরিমিত হইত, তবে আপনার কাজ ফুরাইত না—মনুষ্যের স্বার্থপরতার সীমা নাই—অন্ত নাই। তাই বলি, বার্কো, আপনার কাজ ফুরাইয়াছে, বিবেচনা করিয়া পরহিতে রত হও। এই মুনিবৃত্তি যথার্থ মুনিবৃত্তি। এই মুনিবৃত্তি অবলম্বন কর।

যদি বল, বার্ককোও যদি আপনার জন্য

হোক, পরের জন্য হোক, বিষয়-কার্যে নিরত থাকিব, তবে ঈশ্বরচিন্তা করিব কবে?—পরকালের কাজ করিব কবে? আমি বলি, আশৈশব পরকালের কাজ করিবে, শৈশব হইতে জগদীশ্বরকে হৃদয়ে প্রধান স্থান দিবে। যে কাজ সকল কাজের উপর কাজ, তাহা প্রাচীন কালের জন্য তুলিয়া রাখিবে কেন? শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্কিকো, সকল সময়েই ঈশ্বরকে ডাকিবে। ইহার জন্য বিশেষ অবসরের প্রয়োজন নাই—ইহার জন্য অন্য কোন কার্যের ক্ষতি নাই। বরং দেখিবে, ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে মিলিত হইলে সকল কার্যই মঙ্গলপ্রদ, যশস্কর এবং পরিশুদ্ধ হয়।

আমি বলিতে পারিতেছি, অনেকের এ সকল কথা ভাল লাগিতেছে না। তাঁহারা এতক্ষণ বলিতেছেন, তরঙ্গিণী যুবতীর কথা হইতেছিল—হইতে হইতে আবার ঈশ্বরের নাম কেন? এই মাত্র বৃদ্ধা বয়সের ঢেঁকি পাতিয়া, বঙ্গদর্শনের জন্য ধান ভানিতেছিলে—আবার এ শিবের গীত কেন? দোষ হইয়াছে স্বীকার

করি, কিন্তু, মনে মনে বোধ হয় যে, সকল কাজেই একটু একটু শিবের গীত ভাল ।

ভাল হউক, বা না হউক, প্রাচীনের জন্য উপায় নাই । তোমার তরঙ্গিনী হেমাঙ্গিনী সুর-
ঙ্গিনী কুরঙ্গিনীর দল, আর আমার দিকে ঘেঁষিবে
না । তোমার মিল, কোমত, স্পেন্সর, ফয়রবাক,
মনোরঞ্জন করিতে পারে না । তোমার দর্শন,
বিজ্ঞান, সকলই আমার—সকলই অন্ধের মূগয়া ।
আজিকার বর্ষার দুর্দিনে,—আজি এ কালরাত্রির
শেষ কুলগ্নে,—এ নক্ষত্রহীন অমাবস্যার নিশী
মেঘাগমে,—আমায় আর কে রাখিবে ? এ ভব-
নদীর তপ্ত সৈকতে, প্রখরবাহিনী বৈতরণীর
আবর্ত্তভীষণ উপকূলে—এ দুস্তর পারাবারের
প্রথম তরঙ্গমালার প্রঘাতে, আর আমায় কে
রক্ষা করিবে ? অতি বেগে প্রবল বাতাস বহি-
তেছে—অন্ধকার, প্রভো ! চারি দিকেই অন্ধকার !
আমার এ ক্ষুদ্র ভেলা দুর্ভূতের ভরে বড় ভারি
হইয়াছে । আমায় কে রক্ষা করিবে ?

কমলাকান্তের বিদায় ।

সম্পাদক মহাশয় !

বিদায় হইলাম, আর লিখিব না । বনিল না ।
আপনার সঙ্গে বনিল না, পাঠকের সঙ্গে বনিল
না, এ সংসারের সঙ্গে আমার বনিল না, আমার
আপনার সঙ্গে আর আমার বনিল না । আর কি
লেখা হয় ? বেসুরে কি এ বাঁশী বাজে ? বাঁশী
বাজি বাজি করে, তবু বাজে না—বাঁশী ফাটি-
য়াছে । আবার বাজ দেখি, হৃদয়ের বংশী ! হায় !
তুই কি আর তেমনি করিয়া বাজিতে জানিস্ ?
আর কি সে তান মনে আছে ? না, তুই সেই
আছিস্—না আমি সেই আমি আছি । তুই ঘুণে
ধরা বাঁশী—আমি ঘুণে ধরা—আমি ঘুণে ধরা কি
ছাই তা আমি জানি না । আমার সে স্বর নাই
—আর বাজাইব কি ? আর সে রস নাই, শুনিবে
কে ? এক বার বাজ দেখি, হৃদয় ! এই জগৎ

সংসারে—বধির, অর্থচিন্তায় বিভ্রত, মুঢ় জগৎ
সংসারে, সেই রূপ আবার মনের লুকান কথা-
গুলি তেমনি করিয়া বল্ দেখি ? বলিলে কেহ
শুনিবে কি ? তখন বয়স্ ছিল—কত কাল হইল
সে দপ্তর লিখিয়াছিলাম—এখন সে বয়স, সে
রস নাই—এখন সে রস ছাড়া কথা কেহ শুনিবে
কি ? আর সে বসন্ত নাই—এখন গলা-ভাঙ্গা
কোকিলের কুহুরব কেহ শুনিবে কি ?

ভাই, আর কথায় কাজ নাই—আর বাজিয়া
কাজ নাই—ভাঙ্গা বাঁশে মোটা আওয়াজে আর
কুকুর-রাগিণী ভাঁজিয়া কাজ নাই। এখন হাসিলে
কেহ হাসিবে না—কাঁদিলে বরং লোকে হাসিবে।
প্রথম বয়সের হাসিকান্নায় সুখ আছে—লোকে
সঙ্গে সঙ্গে হাসে কাঁদে ;—এখন হাসিকান্না !
ছি !—কেবল লোকহাসান !

হে সম্পাদককুলশ্রেষ্ঠ ! আপনাকে স্বরূপ
বলিতেছি—কমলাকান্তের আর সে রস নাই।
আমার সে নসীবাবু নাই—অহিফেনের অনাটন
—সে প্রসন্ন গোয়ালিনী নাই—তাহার সে মঙ্গলা
গাভী নাই। সত্য বটে, আমি তখনও একা—এখ-

নও একা—কিন্তু তখন আমি একায় এক মহত্ব
 —এখন আমি একায় একমাত্র। কিন্তু একার এত
 বন্ধন কেন? যে পাখীটি পুষিয়াছিলাম—কবে
 মরিয়া গিয়াছে—তাহার জন্য আজিও কাঁদি ;
 যে ফুলটি ফুটাইয়াছিলাম—কবে শুকাইয়াছে,
 তাহার জন্য আজিও কাঁদি ; যে জলবিন্দু, এক-
 বার জলস্রোতে সূর্যরশ্মি সম্প্রভাত দেখিয়াছি-
 লাম—তাহার জন্য আজিও কাঁদি। কমলাকান্ত
 অন্তরের অন্তরে সন্ন্যাসী—তাহার এত বন্ধন
 কেন? এ দেহ পচিয়া উঠিল—ছাই ভস্ম মনের
 বাঁধনগুলো পচে না কেন? ঘর পুড়িয়া গেল—
 আগুন নিবে না কেন? পুকুর শুকাইয়া আসিল
 —এ পক্ষে পঙ্কজ ফুটে কেন? ঝড় থামিয়াছে
 —দরিয়ায় তুফান কেন? ফুল শুকাইয়াছে—
 এখনও গন্ধ কেন? সুখ গিয়াছে—আশা কেন?
 স্মৃতি কেন? জীবন কেন? ভালবাসা গিয়াছে—
 যত্ন কেন? প্রাণ গিয়াছে—পিণ্ডদান কেন?
 কমলাকান্ত গিয়াছে—যে কমলাকান্ত চাঁদ বিবাহ
 করিত, কোকিলের সঙ্গে গায়িত, ফুলের বিবাহ
 দিত, এখন আবার তার আফিসের বরাদ্দ কেন?

বাঁশী ফাটিয়াছে—আবার সা, ঝ, গ, ম কেন ?
প্রাণ গিয়াছে ভাই, আর নিশ্বাস কেন ? সুখ
গিয়াছে, ভাই, আর কামা কেন ?

তবু কাঁদি। জন্মিবা মাত্র কাঁদিয়াছিলাম,
কাঁদিয়া মরিব। এখন কাঁদিব, লিখিব না।

অনুগত, স্বগত এবং বিগত

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী।

কমলাকান্তের জীবনবন্দী ।

.

;

.

কমলাকান্তের জীবনবন্দী ।

সেই আফিস্থোর কমলাকান্তের অনেক দিন কোন সম্বাদ পাই নাই । অনেক সন্ধান করিয়া-ছিলাম, অকস্মাৎ সম্প্রতি এক দিন তাহাকে ফৌজদারী আদালতে দেখিলাম । দেখি যে, ব্রাহ্মণ এক গাছতলায় বসিয়া, গাছের গুঁড়ি ঠেসান দিয়া, চক্ষু বুজিয়া ডাবায় তামাকু টানিতেছে । মনে করিলাম, আর কিছু না, ব্রাহ্মণ লোভে পড়িয়া কাহার ডিবিয়া হইতে আফিস্থ চুরি করিয়াছে— অন্য সামগ্রী কমলাকান্ত চুরি করিবে না—ইহা নিশ্চিত জানি । নিকটে এক জন কালোকোর্তা কনষ্টেবলও দেখিলাম । আমি বড় দাঁড়াইলাম না—কি জানি যদি কমলাকান্ত জামিন হইতে বলে । তফাতে থাকিয়া দেখিতে লাগিলাম যে, কাণ্ডটা কি হয় ।

কিছু কাল পরে কমলাকান্তের ডাক হইল । তখন এক জন কনষ্টেবল রুল ঘুরাইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া এজলামে লইয়া গেল । আমি পিছু

পিছু গেলাম। দাঁড়াইয়া, দুই একটি কথা শুনিয়া, ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিলাম।

এজলাসে, প্রথামত মাচানের উপর হাকিম বিরাজ করিতেছেন। হাকিমটি এক জন দেশী ধর্ম্মাবতার—পদে ও গৌরবে ডিপুটি। কমলাকান্ত আসামী নহে—সাক্ষী। মোকদ্দমা গোরু-চুরি। ফরিয়াদী সেই প্রসন্ন গোয়ালিনী।

কমলাকান্তকে সাক্ষীর কাটরায় পুরিয়া দিল। তখন কমলাকান্ত য়দু য়দু হাসিতে লাগিল। চাপরাশী ধমকাইল—“হাস কেন?”

কমলাকান্ত যোড়হাত করিয়া বলিল, “বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি—যে, আমাকে এর ভিতর পুরিলে?”

চাপরাশী মহাশয় কথাটা বুঝিলেন না। দাড়ি ঘুরাইয়া বলিলেন, “তামাসার জায়গা এ নয়— হলফ পড়।”

কমলাকান্ত বলিল, “পড়াও না, বাপু!”

এক জন মুহুরি তখন হলফ পড়াইতে আরম্ভ করিল। বলিল; “বল, আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া—”

কমলাকান্ত। (সবিস্ময়ে) কি বলিব ?

মুহুরি। শূন্যে পাও না—“পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—”

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে ! কি সর্বনাশ !

হাকিম দেখিলেন, সাক্ষীটা কি একটা গণ্ড-গোল বাধাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, “সর্বনাশ কি ?”

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনেছি—এ কথাটা বলতে হবে ?

হাকিম। ক্ষতি কি ? হলফের ফারমই এই।

কমলা। হজুর সুবিচারক বটে। কিন্তু একটা কথা বলি কি, সাক্ষ্য দিতে দিতে দুই একটা ছোট রকম মিথ্যা বলি, না হয় বলিলাম—কিন্তু গোড়াতেই একটা বড় মিথ্যা বলিয়া আরম্ভ করিব সেটা কি ভাল ?

হাকিম। এর আর মিথ্যা কথা কি ?

কমলাকান্ত মনে মনে বলিল, “তত বুদ্ধি থাকিলে তোমার কি এ পদবুদ্ধি হইত ?” প্রকাশ্যে বলিল, “ধর্মাবতার, আমার একটু একটু বোধ

হইতেছে কি যে, পরমেশ্বর ঠিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। আমার চোখের দোষই হউক আর যাই হউক, কখনও ত এ পর্যন্ত পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম না। আপনারা বোধ হয় আইনের চসমা নাকে দিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন—কিন্তু আমি যখন তাঁহাকে এ ঘরের ভিতর প্রত্যক্ষ পাইতেছি না—তখন কেমন করিয়া বলি—আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—”

ফরিয়াদীর উকীল চটিলেন—তাঁহার মূল্যবান সময়, যাহা মিনিটে মিনিটে টাকা প্রসব করে, তাহা এই দরিদ্র সাক্ষী নষ্ট করিতেছে। উকীল তখন গরম হইয়া বলিলেন, “সাক্ষী মহাশয়! Theological Lectureটা ব্রাহ্মসমাজের জন্য রাখিলে ভাল হয় না? এখানে আইনের মতে চলিতে মনস্থির করুন।”

কমলাকান্ত তাহার দিকে ফিরিল। য়ুছু হাসিয়া বলিল, “আপনি বোধ হইতেছে উকীল।”

উকীল। (হাসিয়া) কিমে চিনিলে?

কমলা । বড় সহজে—মোট চেন আর ময়লা শামলা দেখিয়া । তা, মহাশয় ! আপনাদের জন্য এ Theological Lecture নয় । আপনারা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখেন স্বীকার করি—যখন মোয়াক্কেল আসে ।

উকীল সরোষে উঠিয়া হাকিমকে বলিলেন, “I ask the protection of the Court against the insults of this witness.”

কোর্ট বলিলেন, “Oh Baboo ! the witness is your own witness, and you are at liberty to send him away if you like.”

এখন, কমলাকান্তকে বিদায় দিলে উকীল বাবুর মোকদ্দমা প্রমাণ হয় না—সুতরাং উকীল বাবু চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন । কমলাকান্ত ভাবিলেন, এ হাকিমটি জাতিভ্রষ্ট—পালের মত নয় ।

হাকিম গতিক দেখিয়া, মুহুরিকে আদেশ করিলেন যে, “ওথের প্রতি সাক্ষীর objection আছে—উহাকে simple affirmation দাও ।” তখন মুহুরি-

কমলাকান্তকে বলিল, “আচ্ছা, ও ছেড়ে দাও—বল, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি—বল !”

কমলা । কি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সেটা জানিয়া প্রতিজ্ঞাটা করিলে ভাল হয় না ?

মুহুরি হাকিমের দিকে চাহিয়া বলিল, “ধর্ম্ম-বতার ! সাক্ষী বড় সেরুকশ্ ।”

উকীল বাবু হাঁকিলেন, “Very obstructive” ।

কমলাকান্ত । (উকীলের প্রতি) “শাদা কাগজে দস্তখত করিয়া লওয়ার প্রথাটা আদালতের বাহিরে চলে জানি—তিতরেও চলিবে কি ?”

উকীল । শাদা কাগজে কে তোমার দস্তখত লইতেছে ?

কমলা । কি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, তাহা না জানিয়া, প্রতিজ্ঞা করা, আর কাগজে কি লেখা হয়, তাহা না দেখিয়া, দস্তখত করা, একই কথা ।

হাকিম তখন মুহুরিকে আদেশ করিলেন যে, “প্রতিজ্ঞা আগে ইহাকে শুনাইয়া দাও—গোল-মালে কাজ নাই ।” মুহুরি তখন বলিল, “শোন, তোমাকে বলিতে হইবে যে, আমি প্রতিজ্ঞা করি-

তেছি যে, আমি যে সাক্ষ্য দিব, তাহা সত্য হইবে, আমি কোন কথা গোপন করিব না—সত্য ভিন্ন আর কিছু হইবে না ।”

কমলা । ওঁ মধু মধু মধু ।

মুহুরি । সে আবার কি ?

কমলা । পড়ান, আমি পড়িতেছি ।

কমলাকান্ত তখন আর গোলযোগ না করিয়া প্রতিজ্ঞা পাঠ করিল । তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য উকীল বাবু গাত্রোখান করিলেন, কমলাকান্তকে চোখ রাঙ্গাইয়া বলিলেন, “এখন আর বদমায়েশি করিও না—আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তার যথার্থ উত্তর দাও । বাজে কথা ছাড়িয়া দাও ।”

কমলা । আপনি যা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাই আমাকে বলিতে হইবে ? আর কিছু বলিতে পাইব না ?

উকীল । না ।

কমলাকান্ত তখন হাকিমের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “অথচ আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, ‘কোন কথা গোপন করিব না ।’ ধর্ম্মাবতার, বে-

আদবি মাফ হয় । পাড়ায় আজ একটা যাত্রা হইবে, শুনিতে যাইব ইচ্ছা ছিল ; সে সাধ এই-খানেই মিটিল । উকীল বাবু অধিকারী—আমি যাত্রার ছেলে, যা বলাইবেন, কেবল তাই বলিব ; যা না বলাইবেন, তা বলিব না । যা না বলাইবেন, তা কাজেই গোপন থাকিবে । প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অপরাধ লইবেন না ।”

হাকিম । যাহা আবশ্যক বিবেচনা করিবে, তাহা না জিজ্ঞাসা হইলেও বলিতে পার ।

কমলাকান্ত তখন সেলাম করিয়া বলিল, “বহৎ খুব ।” উকীল তখন জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন, “তোমার নাম কি ?”

কমলা । শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী ।

উকীল । তোমার বাপের নাম কি ?

কমলা । জীবানবন্দীর আভ্যুতিক আছে না কি ?

উকীল গরম হইলেন, বলিলেন, “হজুর ! এ সব Contempt of Court !” হজুর, উকীলের দুর্দশা দেখিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট নন—বলিলেন, “আপনারই সাক্ষী ।” স্মরণ্য উকীল আবার কমলা-

কান্তের দিকে ফিরিলেন, বলিলেন, “বল ।
বলিতে হইবে ।”

কমলাকান্ত পিতার নাম বলিল । উকীল
তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি জাতি ?”

কমলা । আমি কি একটা জাতি ?

উকীল । তুমি কোন্ জাতীয় ?

কমলা । হিন্দু জাতীয় ।

উকীল । আঃ ! কোন্ বর্ণ ?

কমলা । ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ ।

উকীল । দূর হোক্ ছাই ! এমন সাক্ষীও
আনে ! বলি তোমার জাত আছে ?

কমলা । মারে কে ?

হাকিম দেখিলেন, উকীলের কথায় হইবে
না । বলিলেন, “ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত, হিন্দুর
নানা প্রকার জাতি আছে জান ত—তুমি তার
কোন্ জাতির ভিতর ?”

কমলা । ধর্ম্মাবতার । এ উকীলেরই ধৃষ্টতা ।
দেখিতেছেন আমার গলায় যজ্ঞোপবীত, নাম বলি-
য়াছি চক্রবর্তী—ইহাতেও যে উকীল বুঝেন নাই
বে, আমি ব্রাহ্মণ, ইহা আমি কি প্রকারে জানিব ?

হাকিম লিখিলেন, “জাতি ব্রাহ্মণ ।” তখন উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার বয়স কত ?”

এজ্জামে একটা ক্লক ছিল—তাহার পানে চাহিয়া হিসাব করিয়া কমলাকান্ত বলিল, “আমার বয়স ৫১ বৎসর, দুই মাস, তের দিন, চারি ঘণ্টা, পাঁচ মিনিট—”

উকীল । কি জ্বালা ! তোমার ঘণ্টা মিনিট কে চায় ?

কমলা । কেন এই মাত্র প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন যে, কোন কথা গোপন করিব না ।

উকীল । তোমার যা ইচ্ছা কর ! আমি তোমায় পারি না । তোমার নিবাস কোথা ?

কমলা । আমার নিবাস নাই ।

উকীল । বলি, বাড়ী কোথা ?

কমলা । বাড়ী দূরে থাক, আমার একটা কুঠারীও নাই ।

উকীল । তবে থাক কোথা ?

কমলা । যেখানে সেখানে ।

উকীল । একটা আড্ডা ত আছে ?

কমলা। ছিল, যখন নসীবাবু ছিলেন।
এখন আর নাই।

উকীল। এখন আছ কোথা?

কমলা। কেন, এই আদালতে।

উকীল। কাল ছিলে কোথা?

কমলা। একখানা দোকানে।

হাকিম বলিলেন, “আর বকাবকিতে কাজ
নাই—আমি লিখিয়া লইতেছি, নিবাস নাই।
তার পর?

উকীল। তোমার পেশা কি?

কমলা। আমার আবার পেশা কি? আমি কি
উকীল না বেশ্যা, যে আমার পেশা আছে?

উকীল। বলি, খাও কি করিয়া?

কমলা। ভাতের সঙ্গে ডাল মাখিয়া, দক্ষিণ
হস্তে গ্রাস তুলিয়া, মুখে পুরিয়া গলাধঃকরণ
করি।

উকীল। সে ডাল ভাত জোটে কোথা
থেকে?

কমলা। ভগবান্ জোটেইলেই জোটে,
নইলে জোটে না।

উকীল। কিছু উপার্জন কর ?

কমলা। এক পয়সাও না।

উকীল। তবে কি চুরি কর ?

কমলা। তাহা হইলে ইতিপূর্বেই আপনার
শরণাগত হইতে হইত। আপনি কিছু ভাগও
পাইতেন।

উকীল, তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া, আদাল-
তকে বলিলেন, “আমি এ সাক্ষী চাহি না।
আমি ইহার জীবানবন্দী করাইতে পারিব না।”

প্রসন্ন বাদিনী, উকীলের কোমর ধরিল ;
বলিল, “এ সাক্ষী ছাড়া হইবে না। এ বামন
সত্য কথা বলিবে, তাহা আমি জানি—কখনও
মিছা বলে না। উহাকে তোমরা জিজ্ঞাসা
করিতে জান না—তাই ও অমন করিতেছে। ও
বামনের আবার পেশা কি ? ও এর বাড়ী ওর
বাড়ী খেয়ে বেড়ায়, ওকে জিজ্ঞাসা করিতেছ,
উপার্জন কর ! ও কি বলবে ?”

উকীল তখন হাকিমকে বলিল, “লিখুন,
পেশা ভিক্ষা।”

এ বার কমলাকান্ত রাগিল, “কি ? কমলাকান্ত

চক্রবর্তী ভিক্ষোপজীবী ? আমি মুক্তকণ্ঠে হল-
ফের উপর বলিতেছি, আমি কখন কাহারও
কাছে এক পয়সা ভিক্ষা চাই নাই।”

প্রসন্ন আর থাকিতে পারিল না—সে বলিল,
“সে কি ঠাকুর ! কখনও আফিস্ চেয়ে খাও
নি ?”

কমলা । দূর যোগি ধেমো গয়লার মেয়ে !
আফিস্ কি পয়সা ! আমি কখন একটি পয়সাও
কাহারও কাছে ভিক্ষা লই নাই ।

হাকিম হানিয়া বলিলেন, “কি লিখিব,
কমলাকান্ত ?”

কমলাকান্ত নরম হইয়া বলিল, “লিখুন,
পেশা ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ-গ্রহণ ।” সকলে
হাসিল—হাকিম তাই লিখিয়া লইলেন ।

তখন উকীল মহাশয় মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত
হইলেন । জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এই করি-
য়াদীকে চেন ?”

কমলা । না ।

প্রসন্ন হাঁকিল, “সে কি, ঠাকুর ! চিরটা কাল
আমার দুধ দই খেলে, আজ বল চিনি না ?”

কমলাকান্ত বলিল, “তোমার দুধ দই চিনি না, এমন কথা ত বলতেছি না—তোমার দুধ দই বিলক্ষণ চিনি। যখনই দেখি এক পোওয়া দুধে তিন পোওয়া জল, তখনই চিনিতে পারি যে, এ প্রসন্ন গোয়ালীর দুধ; যখনই দেখতে পাই যে, ঘোলের চেয়ে দই ফিঁকে, তখনই চিনিতে পারি যে, এ প্রসন্নময়ীর দধি। তোমার দুধ দই চিনিনে ?

প্রসন্ন নথ ঘুরাইয়া বলিল, “আমার দুধ দই চেন, আর আমায় চিনিতে পার না ?”

কমলাকান্ত বলিল, “মেয়েমানুষকে কে কবে চিনিতে পেরেছে, দিদি ? বিশেষ, গোয়ালার মেয়ের কাঁকালে যদি দুধের কেঁড়ে থাকিল, তবে কার বাপের সাধ্য তাকে চিনে উঠে ?”

উকীল তখন আবার সওয়াল করিতে লাগিল, “বুঝা গেল ; তুমি বাদিনীকে চেন—উহার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ আছে ?”

কমলা। মন্দ নয়—এত গুণ না থাকিলে কি উকীল হয় !

উকীল। তুমি আমার কি গুণ দেখিলে ?

কমলা । বামনের ছেলে গোয়ালার মেয়েতেও
আপনি একটা সম্বন্ধ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন ।

উকীল । এমন সম্বন্ধ কি হয় না ? কে জানে
তুমি ওর পোষ্যপুত্র কি না ?

কমলা । ওর নয়, কিন্তু ওর গাইয়ের বটে ।

উকীল । বুঝা গেল, তোমার সঙ্গে বাদিনীর
একটা সম্বন্ধ আছে, একেবারে সাফ বলিলেই
হইত—এত দুঃখ দাও কেন ? এখন জিজ্ঞাসা
করি, তুমি এ মোকদমার কি জান ?

কমলা । জানি যে, এ মোকদমার আপনি
উকীল, প্রসন্ন ফরিয়াদী, আমি সাক্ষী, আর এই
নেড়ে আসামী ।

উকীল । তা নয়, গোরুচুরির কি জান ?

• কমলা । গোরুচুরি আমার বাপ দাদাও জানে
না । বিদ্যাটা আমায় শিখাইবেন ?—আমার দুধ
দধির বড় দরকার ।

উকীল । আঃ—বলি গোরুচুরী দেখিয়াছ ?

কমলা । এক দিন দেখিয়াছিলাম । নসীবাবর
একটা বকনা—এক বেটা মুচি—

উকীল । কি যন্ত্রণা ! বলি, প্রসন্ন গোয়ালি-

নারী গোরু যখন চুরি যায়, তখন তুমি দেখিয়াছ ?

কমলা । না—চোর বেটার এত বুদ্ধি হয়
নাই যে, আমাকে ডাকিয়া সাক্ষী রাখিয়া গোরুটা
চুরি করে । তাহা হইলে আপনারও কাজের
সুবিধা হইত, আমারও কাজের সুবিধা হইত ।

প্রসন্ন দেখিল, উকীলকে টাকা দেওয়া সার্থক
হয় নাই—তখন আপনার হাতে হাল লইবার
ইচ্ছায়, উকীলের কানে কানে বলিয়া দিল, “ও
বামন সে সব কিছুর সাক্ষী নয়—ও কেবল গোরু
চেনে ।”

উকীল মহাশয় তখন কুল পাইলেন ।
গর্জিয়া উঠিয়া জিহ্বাসা করিলেন, “তুমি গোরু
চেন ?”

কমলাকান্ত মধুর হাসিয়া বলিল, “আহা, চিনি
বই কি—নহিলে কি আপনার সঙ্গে এত মিষ্টা-
লাপ করি ?”

হাকিম দেখিলেন, সাক্ষী বড় বাড়াবাড়ি করি-
তেছে—বলিলেন, “ও সব রাখ ।” প্রসন্ন গোয়া-
লীর শামলা গাই আদালতের সম্মুখে মাঠে বাঁধা
ছিল—দেখা যাইতেছিল । ডিপুটি বাবু সেই

দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এই গোরুটি চেন ?”

কমলাকান্ত যোড়হাত করিয়া বলিল, “কোন গোরুটি, ধর্ম্মাধতার ?”

হাকিম বলিলেন, “কোন গোরুটি কি ? একটি বই ত সামনে নাই ?”

কমলা । আপনি দেখিতেছেন, একটি—আমি দেখিতেছি, অনেকগুলি ।

হাকিম বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “দেখিতে পাইতেছ না—ঐ শামলা ?”

কমলাকান্ত শামলা পাইয়ের দিকে না চাহিয় উকীলের শামলার প্রতি চাহিল । বলিল, “এ শামলাও চুরির না কি ?”

কমলাকান্তের নষ্টামি হাকিম আর সহ করিতে পারিলেন না—বলিলেন, “তুমি আদালতের কাজের বড় বিঘ্ন করিতেছ—Contempt of Court জন্য তোমার পাঁচ টাকা জরিমানা ।”

কমলাকান্ত আত্মমিপ্রণত সেলাম করিয়া যোড়হাত করিয়া বলিল, “বহৎ খুব হজর ! জরিমানা আদায়ের ভার কার প্রতি ?”

হাকিম। কেন ?

কমলা। কিরূপে আদয় করিবেন, সে বিষয়ে তাঁহাকে কিছু উপদেশ দিব।

হাকিম। উপদেশের প্রয়োজন কি ?

কমলা। ইহলোকে ত আমার নিকট জরিমানা আদায়ের কোন সম্ভাবনা নাই—তিনি পরলোকে যাইতে প্রস্তুত কি না জিজ্ঞাসা করিব।

হাকিম। জরিমানা না দিতে পার, কয়েদ যাইবে।

কমলা। কত দিনের জন্য, ধর্ম্মাবতার ?

হাকিম। জরিমানা অনাদায়ে এক মাস কয়েদ।

কমলা। দুই মাস হয় না ?

হাকিম। বেশী মিয়াদের ইচ্ছা কর কেন ?

কমলা। সময়টা কিছু মন্দ পড়িয়াছে—ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ আর ভোজন সুলভ নয়—জেলখানায় যাহাতে মাস দুই ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ হয়, সে ব্যবস্থা যদি আপনি করেন, তবে গরীব ব্রাহ্মণ উদ্ধার পায়।

এরূপ লোককে জরিমানা বা কয়েদ করিয়া

কি হইবে ? হাকিম হাসিয়া বলিলেন, “আচ্ছা তুমি যদি গোল না করিয়া সোজা জোবানবন্দী দাও, তবে তোমার জরিমানা মাপ করা যাইতে পারে । বল—ঐ গোকু তুমি চেন কি না ?”

হাকিম তখন এক জন কনষ্টেবলকে আদেশ করিলেন যে, গোকুর নিকট গিয়া প্রসন্নের গাই দেখাইয়া দেয় । কনষ্টেবল তাহাই করিল । বিষয় উকীল বাবু তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঐ গোকু তুমি চেন ?”

কমলা । সিং-ওয়াল গোকু—তাই বলুন ।

উকীল । তুমি বল কি ?

কমলা । আমি বলি শামলাওয়াল—তাক্—আমি ও সিং-ওয়াল গোকুটা চিনি ।
বিলুক্ষণ আলাপ আছে ।

উকীল । ও কার গোকু ?

কমলা । আমার ।

উকীল । তোমার !

কমলা । আমারই ।

হরি হরি ! প্রসন্নের মুখ শুকাইল ! উকীল দেখিল, মোকদ্দমা ফাঁসিয়া যায় । প্রসন্ন তখন

তর্জন গর্জন করিয়া বলিল, “তবে রে বিট্লে!
গোকু তোমার!”

কমলাকান্ত বলিল, “আমার না ত কার!
আমি ওর দুধ খেয়েছি, ওর দই খেয়েছি—
ওর ঘোল খেয়েছি, ওর ছানা খেয়েছি—ওর
মাখন খেয়েছি, ওর ননী খেয়েছি—ও গোকু
আমার হলো না, তুই বেটি পালিস্ ব’লে কি
তোর বাবার গোকু হলো!”

উকীল অতটা বুঝিলেন না। বলিলেন,
“ধর্ম্মাবতার, witness hostile! permission দিন
আমি ওকে cross করি।”

কমলা। কি? আমায় cross করিবে?

উকীল। হাঁ, করিব।

কমলা। নোকায়, না সাঁকো বেঁধে?

উকীল। সে আবার কি?

কমলা। বাবা! কমলাকান্ত-সাগর পার হও,
এত বড় হনুমান্ তুমি আজও হও নাই।

এই বলিয়া কমলাকান্ত চক্রবর্তী রাগে গর্
গর্ করিয়া কাটরা হইতে নামিয়া যায়—চাপ-
রাশী ধরিয়া আবার কাটরায় পুরিল। তখন

কমলাকান্ত আলু থালু হইয়া নিশ্চেষ্ট হইল—
বলিল, “কর বাবা ক্রস্ কর !—আমি অগাধ সমুদ্রে
পড়িয়া আছি—যে ইচ্ছা সে লক্ষ দাও—“অপা-
মিবাধারমনু তরঙ্গ !”—উকীল মহাশয় ! এ প্রশান্ত
মহাসমুদ্রে তরঙ্গ বিক্ষিপ করে না, আপনি স্বচ্ছন্দে
উল্লঙ্ঘন করুন।”

উকীল তখন কোর্টকে বলিলেন, “ধর্ম্মাবতার,
দেখা যাইতেছে যে, এ ব্যক্তি বাতুল ; ইহাকে
আর ক্রস্ করিবার প্রয়োজন নাই। বাতুল
বলিয়া ইহার জীবনবন্দী পরিত্যক্ত হইবে।
ইহাকে বিদায় দেওয়া হউক।”

হাকিম কমলাকান্তের হাত হইতে নিষ্কৃতি
পাইলে বাঁচেন, বিদায় দিতে প্রস্তুত, এমত
সময়ে প্রসন্ন হাত যোড় করিয়া আদালতে নিবে-
দন করিল, “যদি ছকুম হয়, তবে আমি স্বয়ং
উহাকে গোটা কত কথা জিজ্ঞাসা করি, তার পর
বিদায় দিতে হয়, দিবেন।”

হাকিম কোতূহলী হইয়া অনুমতি দিলেন।
প্রসন্ন তখন কমলাকান্তের প্রতি চাহিয়া বলিল,
“ঠাকুর ! মোতাতের সময় হয়েছে না ?”

কমলা। মৌতাতের আবার সময় কি রে বেটা—“অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যাং নেশাঞ্চ চিন্তয়েৎ।”

প্রসন্ন। অং বং এখন রাখ—এখন মৌতাত করিবে ?

কমলা। দে !

প্রসন্ন। আচ্ছা, আগে আমার কথার উত্তর দাও—তার পর সে হবে।

কমলা। তবে জল্দি জল্দি বল—জল্দি জল্দি জবাব দিই।

প্রসন্ন। বলি, গোরু কার ?

কমলা। গোরু তিন জনের ; গোরু প্রথম বয়সে গুরুমহাশয়ের ; মধ্যবয়সে স্ত্রীজাতির ; শেষবয়সে, উত্তরাধিকারীর ; দড়ি ছিঁড়িবার সময়ে কারও নয়।

প্রসন্ন। বলি, ঐ শামলা-গাই কার ?

কমলা। যে ওর দুধ খায়, তার।

প্রসন্ন। ও গোরু আমার কি না ?

কমলা। তুই বেটা কখন ওর এক বিন্দু দুধ খেলিনে, কেবল বেচে মরুলি, গোরু তোয়

হলো? ও গোরু যদি তোর হয়, তবে বাঙ্গাল
বেঙ্কের টাকাও আমার। দে বেটি, গোরু চোরকে
ছেড়ে দে—গরীবের ছেলে দুধ খেয়ে বাঁচুক।

হাকিম দেখিলেন, দুই জনে বড় বাড়া-
বাড়ি করিতেছে—আদালত মেছো-হাটা হইয়া
উঠিল। তখন উভয়কে ধমক দিয়া, জিজ্ঞাসাবাদ
নিজহস্তে লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,

“প্রসন্ন এই গোরুর দুধ বেচে?”

•কমলা। আজ্ঞা, হাঁ।

“উহার গোহালে এই গোরু থাকে?”

কমলা। ও গোরুও থাকে, আমিও কখন
কখন থাকি।

“ঐ খাওয়ায়?”

কমলা। উভয়কে।

বাদিনীর উকীল তখন বলিলেন, “আমার
কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে—আমি উহাকে আর
জিজ্ঞাসা করিতে চাই না।” এই বলিয়া তিনি
উপবেশন করিলেন। তখন আশামীর উকীল
গাত্তোখান করিলেন। দেখিয়া কমলাকান্ত
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আবার তুমি কে?”

আশামীর উকীল বলিলেন, “আমি আশামীর পক্ষে তোমাকে ক্রম্ করিব ।”

কমলা । এক জন ত ক্রম্ করিয়া গেল, আবার তুমি কুমার বাহাদুর এলে না কি ?

উকীল । কুমার বাহাদুর কে ?

কমলা । রাজপুত্রকে চেন না ? ত্রেতা যুগে আগে ক্রম্ করিলেন, পবনাস্বজ মহাশয় । তার পর ক্রম্ করিলেন, কুমার বাহাদুর ?*

উকীল । ও সব রাখ—তুমি গোরু চেন বলেছ—কিসে চেন ?

কমলা । কখন শিঙ্গে—কখন শামলায় !

উকীল রাগিয়া উঠিয়া, গর্জন করিয়া, টেবিল চাপড়াইয়া বলিলেন,

“তোমার পাগলামি রাখ—তুমি এই গোরু চিনিতে পারিতেছ কিসে ?”

কমলা । ঐ হান্সা-রবে ।

উকীল হতাশ হইয়া বলিলেন, “Hopeless !”

উকীল মহাশয় বসিয়া পড়িলেন—আর জেরা

করিবেন না । কমলাকান্ত বিনীতভাবে বলিল,
“দড়ি ছেঁড় কেন, বাবা ?”

উকীল আর জেরা করিবেন না দেখিয়া
হাকিম কমলাকান্তকে বিদায় দিলেন । কমলা-
কান্ত উর্দ্ধ্বশ্বাসে পলাইল । আমি কিছু কাজ সারিয়া
বাহিরে আসিয়া দেখিলাম যে, কমলাকান্ত
খেলো হুঁকা হাতে করিয়া বসিয়া আছে—চারি
দিকে লোক জমিয়াছে—প্রসন্নও সেখানে
আসিয়াছে । কমলাকান্ত তাহাকে তিরস্কার করি-
তেছে আর বলিতেছে, “তোমার মঙ্গলার বাঁটের
দিব্য, তোমার দুধের কেঁড়ের দিব্য, তোমার ঘোল-
মউনির দিব্য, তোমার ফাঁদি-নথের দিব্য, তুই যদি
চোরকে গোরু ছেড়ে না দিস্ !”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “চক্রবর্তী মহাশয় !
চোরকে গোরু ছাড়িয়া দিবে কেন ?”

কমলাকান্ত বলিল, “পূর্বকালে মহারাজা
স্যেনজিৎকে এক ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল যে, ‘বৎস,
গোপ স্বামী ও তস্কর ইহাদের মধ্যে যেন্দু
দুগ্ধ পান করে, সেই তাহার যথার্থ অধিকারী ।
অন্যের তাহার উপর মমতা প্রকাশ করা বিড়ম্বনা

মাত্র।* এই হলো ভীষ্মদেব ঠাকুরের Hindu Law, আর ইহাই এখনকার ইউরোপের International Law। যদি সভ্য এবং উন্নত হইতে চাও, তবে কাড়িয়া খাইবে। গো শব্দে খেই বুঝ আর পৃথিবীই বুঝ, ইনি তক্ষরভোগ্যা। সেকন্দের হইতে নাপোলেওঁ পর্য্যন্ত সকল তক্ষরই ইহার প্রমাণ। অতএব, হে প্রসন্ন নামে গোপকন্যে! তুমি আইনমতে কার্য কর। চোরকে গোরু ছাড়িয়া দাও।”

এই বলিয়া কমলাকান্ত সেখান হইতে চলিয়া গেল। দেখিলাম, মানুষটা, নিতান্ত ক্ষেপিয়া গিয়াছে।

খোসনবীশ জুনিয়র।

সম্পূর্ণ।



বঙ্কিম বাবুর পুস্তকের বিজ্ঞাপন ।

শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত পুস্তক সকল
নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায় ।

কলিকাতা ১৪৮ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্‌ সংস্কৃত প্রেস্
ডিপজিটরী ।

পটলডাঙা ক্যানিং লাইব্রেরী ।

চীনাবাজার পদ্মচন্দ্র নাথের দোকান ।

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী গুরুদাস বাবুর নিকট ।

কর্ণওয়ালিস্ট্রীট্‌ বি, ব্যানার্জির দোকান ।

সোমপ্রকাশ প্রেস্ ডিপজিটরী ।

পুস্তক	মূল্য	মার	ডাক	মাণ্ডল
দেবী চৌধুরানী	২১
আনন্দ মঠ	১০/০
হুর্গেশনন্দিনী	১০/০
বিষবৃক্ষ	১০
চন্দ্রশেখর	২১
কৃষ্ণকান্তের উইল	৫০/০
কপালকুণ্ডলা	২১
মৃগালিনী	২১
রজনী	১০/০
রাজসিংহ	১০

পুস্তক মূল্য মায় ডাক মাণ্ডল

উপকথা (ইন্দিরা, দুগলাসুরীয়, রাধারাণী) ১০

প্রবন্ধ-পুস্তক ... ৫০/০

কমলাকান্তের দপ্তর ... ২১০

কবিতা-পুস্তক ... ১০/০

বিজ্ঞান-রহস্য ... ১০

লোক-রহস্য ... ১০

অন্যান্য লেখকের পুস্তক।

শৈশব-সহচরী ... ২

কর্ণমালা ... ১০/০

মধুমতী ... ১০

মাধবীলতা (নূতন পুস্তক, বঙ্গদর্শনে কিয়দংশমাত্র

প্রকাশিত) ... ১১০

